নীলিমায় নীল

নারায়ণ সান্যাল

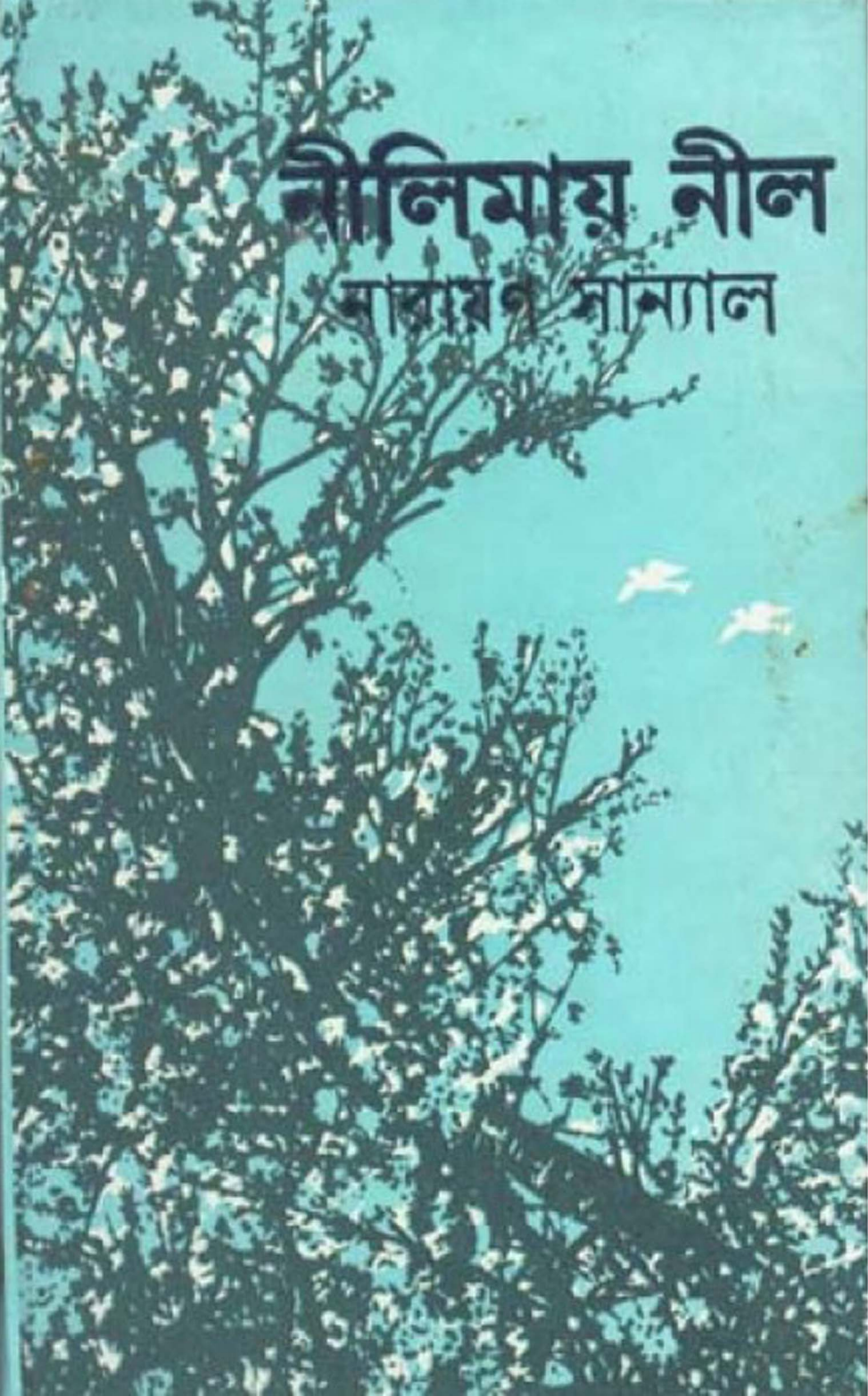

নীলিমায় নীল

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

নীলিমায় নীল

শাশ্বতী সান্যাল

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

অণিমা সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬৩

মুদ্রাকর : শ্রীকুশধ্বজ মান্না, মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬

শ্রীইন্দিরা মৈত্র

৺চণ্ডীদাস মৈত্র

যুগলকরকমলেষু

চিঠি-চিঠি-চিঠি !

এক এক ধাপে তিন তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বাদল উঠে আসে একতলা থেকে দোতলায়। পর্দা সরিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে—মা নয়, ছোড়দি নয়, দাদা-বউদিরও নয়—দিদির চিঠি !

দিদির দিকে একটা অ্যাক্যুরেট-থ্রো করে। অব্যর্থ লক্ষ্যে ইন্-সুইং বলের মতো খামখানা এসে পড়ে শর্মিলার কোলের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী চিৎকার—হাউস দ্যাট !

মিসেস বোস ধমকে ওঠেন, ও আবার কি অসভ্যতা, দিন দিন বাঁদর হয়ে উঠছ একটা।

হঠাৎ যেন এক ফুঁয়ে নিবে যায় বাদল। দিদি এল. বি হয়েছে নির্ঘাৎ, কিন্তু আম্পায়ারের নির্দেশ সে মেনে নেয় নির্বিচারে। মাথাটা নিচু করে বলে—আয়াম সরি !

যেন নিজেই বোল্ড-আউট হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরছে।

মিসেস স্বাগতা বোসের বাড়ির ব্যবস্থা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। সকাল সাতটায় সকলকে এসে বসতে হয় ব্রেকফাস্ট টেবিলে। যদি কোন কারণে কারও দেরি হয়ে যায় তাহলে সে ওই বাদলের মতো সলজ্জকণ্ঠে বলে, আয়াম সরি ! এ নিয়ম চলে আসছে সেই সাহেবের আমল থেকে। আজ আর সাহেব নেই, কিন্তু তাঁর প্রচলিত আইন আছে অব্যাহত। মিসেস বোস অবশ্য এর আগেও একবার চা খান বিছানায় শুয়ে শুয়ে। চায়ের প্রথম পাট মেটাবার দায় জনার্দনের। বোস-সাহেবের আমলের পুরাতন ভৃত্য সে। ঘরে ঘরে পেঁছে দিয়ে আসে বেড-টি। শুধু মিসেস বোসের ঘরে রেখে আসে কাপ নয়, গোটা পটটাই—টি-কোজি দিয়ে ঢেকে। তারিয়ে তারিয়ে দু-আড়াই কাপ চা খান তিনি শয্যাত্যাগ করার আগেই। স্বামী গত হবার পর অনেক কিছুই ত্যাগ করেছেন—কর্তার দেওয়া এই নেশাটিকে ছাড়তে পারেননি।

কিন্তু শয্যা-চায়ের সে আয়োজনটা ধর্তব্যের বাইরে। বাদলের ভাষায় সেটা 'ট্রায়াল বল'। আসল খেলা শুরু হয় এই চায়ের টেবিলে। সকাল সাতটায়। বাড়ির সকলেই এসে বসে। বাইরের লোক কেউ থাকে না, তবু ওরই মধ্যে সরমা একটু প্রসাধন করে আসে। ঘাড়ে-মুখে লেগে থাকে অল্প অল্প পাউডারের প্রলেপ। এটা মিসেস বোসেরই শিক্ষা, তাঁরই নির্দেশ। অপরেশ একটা কৌচে গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। বাঁ হাতে জ্বলতে থাকে ধূমায়িত সিগার। না, মায়ের সামনে ধূমপানে বাধা নেই। মিসেস বোস আলোকপ্রাপ্তা। ব্যারিস্টারের গৃহিণী। ছেলেমেয়েদের

তিনি বান্ধবী হতে চান, সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সরে থাকতে চান না একান্তে। ফলে চা-পানান্তে চুরুট ধরাবার জন্য অপরেশকে কোন নলচের আড়াল খুঁজতে হয় না। মৌতাতটা চলে আরও কিছুক্ষণ। এ সময়টুকু মিসেস বোসের ভারি প্রিয়। এ যেন মহাকালের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একমুঠো দুর্লভ মুহূর্ত। একটু বেলা বাড়লেই যে যার কক্ষপথে জীবনচক্রে পরিক্রমা শুরু করবে। এ যুগে জীবন বড় জটিল—নিকট আত্মীয়ের জীবনচক্রের সন্ধান তুমি রাখতে পারবে না। রমলা যাবে কলেজে, সেখানে তার একটা ভিন্ন সত্তা। শর্মিলা যাবে অফিসে, সেখানে তার অন্য এক পরিচয়। অপরেশ, ভগবান জানেন কোথায়—তার সন্ধানই জানেন না মিসেস বোস। অথচ এরা সবাই তাঁর সন্তান, তাঁরই রক্তমাংসে গড়া জীব। ফলে মধ্যাহ্ন-আহারটা একত্রে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রাত্রেও তাই। কে কখন ফিরবে তার খবর জানা আছে শুধু ঠাকুরের।

আজও ওঁরা বসেছিলেন প্রাত্যহিক নিয়মে। মিসেস বোসের হাতে একজোড়া নিটিং-এর কাঁটা। অপরেশের দৃষ্টি সকালের কাগজে নিবদ্ধ। সরমা টি-পট থেকে চা ঢালছে কাপে, আর রমলা টোস্টের উপর মোলায়েম করে মাখনের আস্তর লাগাতে ব্যস্ত। একমাত্র বেকার বসেছিল শর্মিলা। বাদলের বডি-লাইন ইন-সুইঙ্গারটা এসে পড়ল তার কোলে। শর্মিলা ম্যানিকিওর-করা দুটি আলতো আঙুলে তুলে ধরল খামটা। পোস্ট-আফিসের ছাপটা দেখে নিয়ে খামটাকে উপুড় করে রেখে দেয় ফের টেবিলের উপর। হাত বাড়ায় চায়ের কাপটার দিকে।

ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে স্বাগতার। কেমন যেন সন্দেহ জেগেছে তাঁর মনে। সন্দেহ নয়, প্রিমনিশন। আজ সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রথম ঘুম ভেঙেছে বিশ্রী একটা দাঁড়কাকের ডাকে। বারান্দার রেলিঙে-বসা কাকটা কর্কশ স্বরে ডাকছিল কা-কা-কা। বিরক্তিকর। স্বাগতার শাশুড়ী—এ বাড়ির প্রাক্তন গৃহিণী জীবিত থাকলে কাকবাবাজীবনের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার করে ছাড়তেন। সেসব সুপারস্টিশন মিসেস বোসের নেই। এ যুগের মানুষ তিনি, কনভেন্ট-লালিত। তবু কেমন যেন অস্বস্তি লেগেছিল তাঁর। হঠাৎ সেই সকালবেলার কর্কশ শব্দটাই মনে পড়ে গেল এ সময়ে। শমু খামটা খুলল না কেন ?

ঠিক ঐ কথাই ভাবছিল সরমা পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে। ঠাকুরঝির চিঠিপত্র তো কই আজকাল আর আসে না। যেসব কলেজের বান্ধবী এককালে মোটা মোটা খাম পাঠাত ওর নামে, তারাও ওর নিরুত্তাপ উদাসীনতায় চিঠি লেখা বন্ধ করেছে ইদানীং। শামুকের মতো নিজের কঠিন বর্মের মধ্যে শর্মিলা গুটিয়ে ফেলেছে নিজেকে। আপন মনে থাকে। খায় দায় অফিস করে। বাইরের

দুনিয়ার সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক না রাখলে নয়, সেটুকুই শুধু বজায় রেখেছে। নরমা আলোকপ্রাপ্তা নয়, সৌন্দর্যের পাসপোর্ট নিয়ে সে প্রবেশ করেছে এই অভিজাত রাজ্যে, মধ্যবিত্তের সংসার থেকে। ফলে অতটা সংযমও নেই তার। মনে মুখে এখনও এক। কৌতূহলটা দমন করতে না পেরে ফস করে বলে বসে—কই, খামটা খুললে না ঠাকুরঝি ?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নির্বিকার ভাবে শর্মিলা বলে—খুললেই হবে।

কৌতূহলী অপরেশও হচ্ছিল যথেষ্ট। খবরের কাগজ থেকে বারে বারে দৃষ্টি সরে যাচ্ছে টেবিলের উপর মূর্ছিত খামখানার দিকে। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, সাদামাটা একখানা ডাকের চিঠি। কিন্তু কী-জানি-কেন অপরেশের মনে হল ঐ চিঠিখানা বিশেষ অর্থবহ। অর্থবহ না অনর্থবহ ? শর্মিলার ভঙ্গিটাই তার প্রমাণ। শমুর হাতটা কাঁপছে। হ্যাঁ, ঠিকই চায়ের কাপটাকে সে ঠিকমত ধরে রাখতে পারছে না। বুলিয়ান মার্কেটের পাতাটা মুড়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত অপরেশকে বলতে হল—বিকাশ লিখেছে বুঝি ?

শর্মিলা হাসল। বললে—তার চিঠি তো কালকেই এসেছে তোমার কাছে। আজ বাদে কাল সে আসছে। সে আবার লিখবে কেন ? কই দাদা, তুমি টোস্ট নিলে না ?

—হ্যাঁ নিই। অপরেশ হাতটা বাড়ালো এবং কৌতূহলটা গোটালো। লক্ষ্য করল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় শর্মিলা। এ ক্ষেত্রে অপরেশেরও এ প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া উচিত। সৌজন্যের তাই নির্দেশ। অপরের চিঠির সম্বন্ধে বেশী কৌতূহল দেখানো এটিকেট-বিরুদ্ধ তা হোক না কেন নিজের বোনের চিঠি। কিন্তু তবু অপরেশ চুপ করে যেতে পারে না। ধরতে গেলে সে এখন এ পরিবারের অভিভাবক। বললে—কাল চিঠি লিখেছে বলে আজ আর লিখবে না এমন কি মানে আছে ? চিঠি কি লোকে শুধু প্রয়োজনেই লেখে ?

শর্মিলা স্মিত হাসল।

মিসেস বোস এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন সকলকে। হাতের কাঁটা দুটো তাঁর অনেকক্ষণ থেমে আছে। মনের কাঁটাটাই খচখচ করে বিঁধছে। শর্মিলা এভাবে সকলের জবাব এড়িয়ে যেতে চাইছে কেন ? কোথা থেকে এসেছে চিঠিখানা তা খোলাখুলি বলে দিতেই বা বাধা কোথায় ? অপরের চিঠির বিষয়ে তাঁর বিশেষ কৌতূহল নেই। ছেলেমেয়েদের তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। যে খুশি লিখুক না কেন চিঠি তাঁর ছেলেমেয়েদের, তাঁর কী ? আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্বামী ও স্ত্রীর চিঠি সম্বন্ধে কৌতূহল দেখায় না, তা এ তো মেয়ে। তবু জেদী মেয়েটা যখন সব প্রশ্নই কৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইছে তখন তিনি আর না বলে পারলেন না—ছাপটা কোন্ পোস্ট অফিসের ?

হঠাৎ কি হল শর্মিলার ! খপ করে উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে। ঠক করে আধ

খাওয়া চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখে টেবিলে। খামটা সজোরে ছুঁড়ে দেয় মায়ের দিকে, ঠিক যে ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য এইমাত্র ধমক খেয়েছে বাদল। বেশ জোরের সঙ্গে বলে—হ্যাঁ তোমরা যা ভাবছ তাই। বহরমপুরেরই চিঠি। নাও, খুলে পড়। প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।

দুম দুম করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শর্মিলা।

মিসেস বোস স্তম্ভিত। অপরেশ চশমাটা খুলে অকারণেই কাচটা মুছতে থাকে। সরমা একবার স্বামী একবার শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে যাই দেখি, জনার্দন বাজারে গেল কিনা।

জনার্দন বাজারে গেল কিনা দেখবার কোন প্রয়োজন নেই। যন্ত্রের মতো সে কাজ করে যায়। এতক্ষণ সে বসে নেই, বাজারে বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু ঐরকম একটা অছিলা করে স্থানটা ত্যাগ করা দরকার হয়ে পড়েছিল সরমার। রমলাও একবার দাদার গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল. মায়ের থমথমে মুখের দিকেও। তারপর সেও ভাববাচ্যে বলে ওঠে—আমার আবার প্র্যাকটিকাল ক্লাস আছে আজ তৈরী হয়ে নিই গে।

প্র্যাকটিকাল ক্লাস আছে বেলা দেড়টায়। রমলা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সায়ান্স। দেড়টার ক্লাশে হাজিরা দেবার জন্য এই সাত সকালে তারও ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ঘরের বাতাসটা কেমন ভারী ভারী লাগছে। রমলাও পালিয়ে বাঁচে।

পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলেন মিসেস বোস। পায়ের কাছে পড়ে আছে না-খোলা খামটা। অপরেশ একটু কাশল। মোছা-কাচ চশমাটা চড়াল নাকে। আড় চোখে একবার দেখে নিল মাকে। তারপর একটু নড়েচড়ে উঠতেই মিসেস বোস বলেন তোমারও কোন জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল নাকি?

মিসেস বোসের দৃষ্টি কিন্তু জানালা দিয়ে চলে গেছে বাইরে।

অপরেশ সত্যিই পালাবার তালে ছিল। এ কথায় বসে পড়ে ফের; বলে—কী যে বল মা, আমি আর পালিয়ে যাব কোথায়? এ যে আমারই দায়। বাবা থাকলে না হয়—

কথাটা আর সে শেষ করে না। একটু গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে মুখে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই স্বাগতা বলেন, তা, এ চিঠিখানা কি খোলা হবে না?

অপরেশ বলে—কেন হবে না? যাঁর চিঠি তাঁকে দাও, তিনিই খুলুন।

এতক্ষণে স্বাগতার দৃষ্টি ফিরে আসে। বাইরে থেকে ভেতরে। পূর্ণদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকান এবার। অপরেশ একটু চমকে ওঠে। মায়ের এ দৃষ্টিকে

সে চেনে। স্বাগতা খামটা কুড়িয়ে নিলেন, বলেন — না, এ চিঠি কেউ পড়বে না। এ চিঠি আসেনি। খোলাই হবে না এ খাম।

টি-পয় থেকে দেশলাইটা তুলে নিয়ে মিসেস বোস ফস করে একটা কাঠি জ্বালেন। খামটা ধরেন তার শিখায়। শুধু দেশলাই কাঠিটাই নয়, তাঁর চোখদুটোও যেন জ্বলছে।

অপরেশ মাকে ভয় করে। এ পরিবারে সবাই করে। কিন্তু এখন ভয় করলে চলবে না। খপ করে সে কেড়ে নেয় খামখানা। বলে এ কি করছ তুমি?

- ঠিকই করছি। আমি জানি ঐ চিঠির মধ্যেই আছে আবার নতুন সর্বনাশের বীজ। বিকাশ নিজে থেকেই প্রস্তাব তুলেছে। না না করতে করতে শমু এতদিনে রাজী হয়েছে। কালই দিল্লি থেকে বিকাশ আসছে. আর আশ্চর্য যোগাযোগ! আজই এল এ চিঠি! না না, এখন নতুন করে জট পাকাতে দেব না আমি। ও চিঠি তুই পুড়িয়ে ফেল খোকা। আর আজই মনোহরবাবুকে খবর দে। বিকাশ এলে কালই কথাবার্তা সব পাকা করে ফেল। কী তোদের কোর্ট কাছারীর কারবারটুকু বাকি আছে মিটিয়ে ফেল।

অপরেশ বলে—তা তো বুঝলাম। কিন্তু শমু যখন বলবে, মা. আমার চিঠি কই? কি বলবে তাকে?

—বলব, না পড়েই পুড়িয়ে ফেলেছি সে চিঠি।

—তাই বল তাহলে। এখানা থাক আমার কাছে। ভয় পেও না. ভগ্নীপতির চিঠি আমি খুলে পড়ব না। কিন্তু কে বলতে পারে আইনের চোখে হয়তো এ চিঠিখানাই হয়ে পড়বে ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট। মনোহর কাকাকে না দেখিয়ে আর কোন চিঠিপত্র নষ্ট করা আমাদের উচিত হবে না।

কৃতবিদ্য ব্যারিস্টারের স্ত্রী স্বাগতাকে স্বীকার করে নিতে হল যুক্তিটা।

অপরেশ খামখানা পকেটে রাখে। হাতঘড়িতে দেখে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। দেরি হয়ে গেছে ওর। হাঁক পাড়ে জনার্দন, মহেন্দ্রকে বল গাড়ি বার করতে।

স্বাগতাও উঠে যান নিজের ঘরের দিকে।

রাত্রে অপরেশ যখন ফিরে এল তখন আশপাশের বাড়ির বাতি নিবেছে। গোটা নিউ-আলিপুরটা যেন ঝিমোচ্ছে প্রথম শীতের আমেজে। মাঝে মাঝে দ্রুতগামী ট্যাক্সির শব্দ। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, দু একটা পান-বিড়ির দোকান খোলা আছে এখনও। গাড়ি গ্যারেজ করে অপরেশ উঠে এল দ্বিতলে। মিসেস বোস জেগেই ছিলেন। আলো জ্বলছে তাঁর তিনতলার ঘরে। কিন্তু পুত্র রাত করে ফিরলে আজকাল আর তিনি নিচে নেমে আসেন না খবরদারি

করতে। পাখি এখন নিজের ডানায় ভর দিয়ে উড়তে শিখেছে। মায়ের পক্ষপুটের আড়াল খোঁজে না সে এখন। রাতের আহার্য হটকেসে রাখা আছে। ইলেকট্রিক হীটারে সরমা ফ্রাইগুলো শুধু চটপট ভেজে দেবে। তাঁর আমলে তিনিও তাই করতেন, ব্যারিস্টার বোসসাহেব রাত করে ফিরলে। বছর কয়েক আগে হলেও তিনি একসময়ে নেমে আসতেন। তখন সরমা ছিল না এ সংসারে। এমন রাতও গেছে যখন কর্তার দৃষ্টি এড়িয়ে ছেলেকে বিছানায় শুইতে দিতে হয়েছে। টাই খুলে দিয়েছেন, মোজা খুলে দিয়েছেন ; —এমন কি আচমকা ঘর নোংরা করে ফেললে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ধুয়েও দিয়েছেন। এখন আর সে দায় নেই। কে জানে এত রাত করে খোকা খেয়ে ফিরেছে কি না। সে খবরটার জন্য তাঁর কৌতূহল আছে কিন্তু জানেন, ওরা কেউই সেই কৌতূহলের পেছনে মাতৃহৃদয়টিকে শুধু শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না। ওরা বিব্রত বোধ করবে তিনি নিচে নেমে এলে। স্বাগতা সেটা চান না। খোকার গাড়ি ঢোকার শব্দ পেয়েও তাই তিনি নেমে এলেন না।

অপরেশ কিন্তু আজ নৈশ আহার সেরে আসেনি। জামা জুতো খুলে প্রথমেই ঢোকে বাথরুমে। গরম জল তৈরী আছে। এখন সে স্নান করবে। সরমা ফ্রাই কখানা ভেজে নেবার আয়োজন করে।

ঢিলে পায়জামা আর চীনে কোটটা গায়ে চাপিয়ে অপরেশ বিছানায় উঠে শোয়। ইটালিয়ান কম্বলটা টেনে দেয় পায়ের উপর। বুকের নিচে টেনে নেয় পালকের বালিশ। সামনে টি-পয়ের উপর খাবারের থালা। এই মুহূর্তটিতে সে আর সাহেব নয়, ভারতীয়ও নয়, সে আপরুচি। শীতের রাতে এই আধশোয়া অবস্থায় নৈশ আহার গ্রহণের বিচিত্র ব্যবস্থাটি তার স্বকপোলকল্পিত।

সরমা স্টেনলেস স্টীলের হাতায় আহার্য পরিবেশন করতে করতে বলে—বেশ আছ তুমি। এদিকে বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হয়ে গেল আর তুমি দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে সারাদিন।

গায়ে ফুঁ দিয়ে অপরেশ সারাদিন মোটেই হাওয়া খেয়ে বেড়ায়নি। রীতিমত ছোটাছুটি করতে হয়েছে তাকে। তিনটে মিটিঙ অ্যাটেন্ড করেছে, একটা টেন্ডার দিতে হয়েছে, হিসাবপত্র দেখতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা। তাই সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে—দক্ষযজ্ঞ কিসের ?

—ঠাকুরঝি ক্ষেপে আগুন।

—মা তার চিঠি না পড়েই পুড়িয়ে ফেলেছেন।

—তাই নাকি ?

—ন্যাকা ! যেন জানেন না কিছুই ! তোমার আদিখ্যেতা দেখলে কান্না পায়। তোমরা দুজনেই তো শলাপরামর্শ করে কাণ্ডটি করেছ।

মুখের গ্রাসটা গলাধঃকরণ করে অপরেশ বলে—কে বললে ? মা ?

—আবার কে ?

অপরেশ সতর্কভাবে একবার ওয়াড্রোবটার দিকে তাকায়। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় আবার। ওখানেই হ্যাঙার থেকে ঝুলছে বুশকোটটা। তারই পকেটে খামটা রয়েছে। এখনও খোলা হয়নি। দিনের মধ্যে বার দুই-তিন বার করেছে চিঠিখানা—নাড়াচাড়া করেছে—কিন্তু খোলেনি। হ্যাঁ, বহরমপুরেরই ছাপ। স্পষ্ট পড়া যায় ছাপটা। আনন্দের কাছ থেকেই এসেছে চিঠিখানা। তাই খুলতে পারেনি। হাজার হোক ভগ্নীপতির চিঠি তো। ওর ছোট বোনকে লেখা। অবশ্য দুদিন পরে সে আর ভগ্নীপতি থাকবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদটা আইনত অনুমোদিত হওয়ার অপেক্ষা। তখন আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে আনন্দের আর কোন তফাত থাকবে না পথেঘাটে দেখা হলে মনে হবে এ ভদ্রলোককে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু আজও আইনের চোখে,—আর শুধু আইন কেন সমাজের চোখে, বিবেকের দৃষ্টিতে আনন্দ ওর ভগ্নীপতি। স্ত্রীকে লেখা তার চিঠি অপরেশ খুলবে কোন অধিকারে ?

—চিঠিখানা তোমাদের পড়ে দেখা উচিত ছিল।

অন্যমনস্কের মত অপরেশ বলে—কেন ?

—আজ একবছর পর হঠাৎ ঠাকুরজামাই ওকে কেন চিঠি লিখলেন তা জানা উচিত নয় ?

অপরেশ ধমকে ওঠে দেখ, তোমার ঐ ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই ঈডিয়ামগুলো বাতিল কর দেখি। এতদিন এ বাড়িতে আছ, তবু বদভ্যাসগুলো গেল না তোমার ?

সরমা মুখ টিপে হেসে বলে—স্বভাব না যায় ম'লে! ঠাকুরঝিকে ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোকে ঠাকুরপো আর তোমাকে ওগোই বলব আমি। 'ডার্লিং' ডাক শোনার জন্যে যদি অতটা হা-পিত্যেশ হয়ে থাকে তবে বোনের সঙ্গে বরং তুমিও আর একবার বসে পড় বিয়ের পিঁড়িতে।

অপরেশ জবাব দেয় না। মনটা তার আজ সত্যিই ভারাক্রান্ত। অফিসেও আজ রাগারাগি হয়েছে। তাছাড়া সকালের ডাকে শমুর নামে যে চিঠিখানা এসেছে, তার মর্মার্থ কেউ জানে না; কিন্তু সকলেরই কেন জানি মনে হয়েছে এ সংসারে ছোটখাটো একটি অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার মতো বিস্ফোরণী শক্তি আছে ঐ চিঠিখানির গর্ভে। আনন্দের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে শমু। আজ প্রায় এক বছরের উপর দুজনের মুখ দেখাদেখি নেই, চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও বন্ধ। একদিন ঐ আনন্দের জন্যে শমু এ পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছিল। আজ তার ফল ভোগ করছে সে। এ যে ঘটবে তা জানা ছিল অপরেশের। জেদের বশে

শর্মিলা বিয়ে করেছিল ঐ অপদার্থ মানুষটাকে। জেদ ছাড়া কী? যে পরিবারে, যে পরিবেশে সে বড় হয়ে উঠেছে তাতে ঐ কপর্দকহীন লোকটার সংসারে ঘর মুছে আর বাসন মেজে যে সে জীবনটা কাটাতে পারবে না এ তো জানা কথাই। পরিবারের প্রতিটি প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে সেদিন ভুল করেছিল শমু। ব্যারিস্টার বোস-সাহেব তার আগেই গত হয়েছেন। স্বাগতার কঠোর নির্দেশ অমান্য করে শমু গৃহত্যাগ করেছিল। তার ফল সে ভুগছে এখন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে আবার। আজ এই এক বছরের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ নেই। আনন্দের ছোট বোন উমা অবশ্য একবার এসেছিল। নিশ্চয়ই দৌতকার্যে। কিন্তু স্বাগতা সে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। শমুর সঙ্গে মেয়েটির দেখা হতে দেননি। মিথ্যা কথা বলেছিলেন স্বাগতা—শমু বাড়ি নেই।

আজ দীর্ঘ এক বছর পর কী এমন নূতন কথা জানাতে চায় আনন্দ? সে কি নিজে থেকেই লিগ্যাল সেপারেশনের প্রস্তাব পাঠিয়েছে? কিন্তু আনন্দ তো লিখতে পারে না। সে দৃষ্টিশক্তিহীন। ঠিক কথা। এই চিঠি আনন্দ স্বহস্তে লেখেনি—সে ক্ষমতা তার নেই। আশ্চর্য, এত সহজ কথাটা তার খেয়াল হয়নি কেন? আনন্দ কাউকে দিয়ে এ চিঠি লিখিয়েছে, হয় তার বোন উমা, নয় কোন বন্ধু, অথবা তার উকিল। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অপরেশ যদি চিঠিখানা খুলে পড়ে তাতে দোষের কিছু নেই। অপরেশের ইচ্ছে হল, এখনি এই মুহূর্তেই খামখানা খুলে ফেলে। রহস্যের যবনিকাপাত ঘটায়। কিন্তু না, সরমার সামনে সে কিছু করবে না। বোস-বাড়ির বউ হয়েও সরমা যেন ঠিক এ পরিবারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। অপরেশ তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। না, বিশ্বাসঘাতকতা সরমা কিছু করবে না। কিন্তু সে বড় সরল, বড় সহজ। মিসেস স্বাগতা বোসের উপযুক্ত পুত্রবধূ সে নয়। তাকে কিছু জানতে দেওয়া চলবে না। অপরেশ স্থির করল স্ত্রীকে লুকিয়ে খামখানা আজ রাত্রেই আয়রন চেস্টে সরিয়ে রাখবে। তারপর সময়মত খুলে পড়বে। হ্যাঁ, পড়াই উচিত। এ সব অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। বাজে সেন্টিমেন্টে ইতস্তত করা চলে না। বাবা নেই, সমস্ত দায়িত্ব এখন অপরেশের। শমু রাজী হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনপত্রে সই দিতে রাজী হয়েছে। অন্ধ স্বামীর ঘর করতে আইনত সে বাধ্য নয়। বিকাশকে তার নূতন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতেও রাজী হয়েছে। বিকাশ এ পরিবারের অনেকদিনের পুরানো বন্ধু। জীবনে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। অপরেশের চেয়ে তার রোজগার বেশী। একটু স্নব। তা এ সমাজে কেউ সেটা গায়ে মাখে না। বড়লোকই পারে বড়লোকি চাল মারতে। পাঁচ-সাত বছর ধরে বিকাশকে জানে এ পরিবারের

সবাই। শমুর প্রাক্‌বিবাহজীবনে তার স্যুটারূপে এ বাড়িতে বিকাশের প্রথম আগমন। ব্যারিস্টার বোস-সাহেবও তাকে পছন্দ করতেন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর বুদ্ধিমতী মেয়েটি তাকেই বেছে নেবে জীবনসঙ্গীরূপে। তাঁর সে আশায় ছাই দিয়ে মূর্খ মেয়েটা চলে গিয়েছিল কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল আনন্দের সন্ধানে। বিকাশও বোধ করি সে আঘাতে মর্মাহত হয়েছিল। আসলে তার ভ্যানিটিতে লেগেছিল বেশি। ঠিক হতাশ প্রেমিক হিসাবে নয়, রাগে সে নিজে থেকেই তদ্‌বির করে দিল্লিতে বদলি হয়ে গিয়েছিল। সমাজে বেচারি আর মুখ দেখাতে পারছিল না। তার মতো সুপাত্রকে উপেক্ষা করে একটা মাস্টারের কাছে ধরা দিয়েছে তার বান্ধবী, এ লজ্জা লুকাতে সে দেশত্যাগী হয়ে পড়ে। অপরেশ আশা করেনি সেই বিকাশ আবার রাজী হবে শমুকে বিবাহ করতে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন! এতদিনে শমুর সম্মতি পেয়ে সেই বিকাশই ছুটে আসছে দিল্লি থেকে।

রাত পোহালে কালকেই সে এসে হাজির হবে এখানে। অপরেশ এ সুযোগ ছাড়তে পারে না। কিছুতেই না। দক্ষ নাবিকের মতো এবারে বন্দরে ভিড়িয়ে আনতে হবে হালভাঙা জাহাজ। দেরি করলে চলবে না। ইতস্তত করলে আবার হয়তো ভেঙে যাবে সব। মেয়েদের মন তো, কখন কোথায় ঘনিয়ে উঠবে মেঘ, কোন দিক থেকে বইবে ক্ষ্যাপা হাওয়া—পথ হারাবে জাহাজ।

—কই, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। খেয়ে এসেছ নাকি?

—না না, খাচ্ছি তো। বেশ খিদে আছে আজ। আচ্ছা, শমু অফিস থেকে ফিরে আর বার হয়নি?

—আপিস! না, তিনি আজ আপিস থেকে ফিরেছেনই রাত করে। এই মাত্র।

—তাই নাকি? খুব কাজের চাপ পড়েছে বোধহয়।

—আর ন্যাকামি কর না। তোমাদের আবার আপিস, তার আবার কাজের চাপ! মায়ের কাছে মাসীর গপ্পো!

—তার মানে?

—তার মানে আপিস-করা কাকে বলে যদি জানতে চাও তাহলে আমার বাবাকে দেখ গে, দাদাকে দেখ গে। সেই সকাল সাড়ে আটটায় দুটো নাকে মুখে গুঁজে ছোটে আপিসে। ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে। দু তিনটে টিউশানি সেরে যখন বাড়ি ফেরে তখন নিষুতি রাত।

শ্বশুর এবং শালার সঙ্গে এ জাতীয় তুলনায় অপরেশ নিজেকে খুব অগৌরবান্বিত মনে করে না। হেসে বলে—আমাদেরও তো তাই। আমিও সেই সাত-সকালে বেরিয়ে গেছি, ফিরছি এই নিষুতি রাতে। আর এইমাত্র তো তুমি বললে শমুরও

আজ দিনটা গেছে একই ভাবে।

সরমা মুখ টিপে হেসে বলে—তুমি কোথায়-কোথায় যাও তা অবশ্য জানি না; কিন্তু তোমার বিদ্যেধরী বোনটির কীর্তি জানা আছে আমার। আপিসের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারা রাজ্যি টো টো করে বোরেন।

—কী বলছ তুমি! শমুর অফিস কোথায় তা তুমি জান না?

—খুব জানি, এবং সেখানে যে তিনি যান না তাও জানি।

—এ সব তোমার মিথ্যে সন্দেহ।

—বটে! তবে শোন। আজ সন্ধ্যাবেলায় এসেছিল সেই মিনি মিত্তির। ঐ যে ঠাকুরঝির সঙ্গে কাজ করে। এসে বলে, শর্মিলাদির জ্বর এ বেলায় কত? আমি তো থ। শেষে শুনি আপিসে ফোন করে তোমার গুণবতী বোনটি জানিয়েছেন যে তিনি জ্বরে ভুগছেন। আপিসে যাবেন না।

অপরেশ হেসে ফেলে, বলে—কি করে ম্যানেজ করলে?

—করলাম। প্রথমটা আমতা আমতা করছিলাম। কিন্তু মিনি মিত্তির এক নম্বর ধড়িবাজ। বুঝলাম নির্জলা মিছে কথা বলে ও ভেটকিমুখীর কাছে পার পাওয়া যাবে না। বিকাশবাবুর কথা তো আগের বারই শুনে গেছে, তাই বললুম, কাল বিকাশবাবু আসছেন, তাই নিয়ে ওর কি সব কাজ আছে। জ্বর-টর নয়। মাগী ভারি শয়তান!

অপরেশ বিরক্ত হয়ে বলে কী বিশ্রী ভাষা হচ্ছে তোমার দিন দিন। বিদ্যেধরী, ভেটকিমুখী, মাগী! এ সব কী?

—বললুম তো, ডার্লিং, ডিয়ার শুনবার শখ থাকে, তাহলে টোপরের অর্ডার দাও গে, যাও। আমার দ্বারা ওসব চলবে না।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল অপরেশের। প্লেটটা সরিয়ে রেখে সিগারেট ধরায় এবার। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় শর্মিলাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। শর্মিলা যে ভুল করেছে জীবনে, তার চেয়ে বড় ভুল করে বসে আছে সে। হাজার হোক আনন্দ লোকটা ইন্টেলেকচুয়াল, তার সঙ্গে বসে দু দণ্ড আলাপ করা যায়। আর এ? একই ভুল। একই পরিবারে এ রকম একই ভুল পর পর করে কেউ? দেখেও শেখে না? শমু আগে ভুল করেছে। ঘর না দেখে বর বেছে নিয়েছে। মিল হয়নি ফলে। তা দেখেও কেন সতর্ক হতে পারল না অপরেশ? কেন নিজেই পছন্দ করে এল সরমাকে? অপরেশ তো জানত সরমা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে আসেনি কোনদিন। দুজনের শিক্ষায়-দীক্ষায় জীবনদর্শনে আশমান-জমিন ফারাক। মধ্যবিত্ত সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যে সরমা অত্যন্ত ছোট পরিসরে মানুষ। সে জীবনযাত্রার সঙ্গে র‍্যাশন-ব্যাগ ছেঁড়া ছাতা আর প্রাইভেট ট্যুইশানি অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। তাই আজও জনার্দন বাজারের পয়সা সরাচ্ছে কি না, মহেন্দ্র পেট্রল বেশি খরচ করছে

কি না দেখতেই তার সব এনার্জি ফুরিয়ে যায়। রেস্তোরাঁতে একসঙ্গে খেয়ে তাকে লুকিয়ে টিপস্ দিতে হয় অপরেশকে। সরমা সুন্দরী, খুবই সুন্দরী ছিল সে বিয়ের আগে; কিন্তু স্যোসাইটিতে কি সুন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছিল? কেমন যেন একটা শ্যাভালরির ভূত তখন চেপে বসেছিল অপরেশের ঘাড়ে। ঘুঁটে-কুড়ুনির মেয়েকে বিয়ে করে আনে যে রাজপুত্র তার চরিত্রটা অভিনয় করবার শখ হয়েছিল যেন। অপরেশ আজ দায়ী করে তার মাকে। তিনি বাধা দেননি বলে। বোধ করি একবার বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় স্বাগতা ওর বেলায় আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

—তুমি কি বই-টই কিছু পড়বে? বেড-ল্যাম্পটা জেবলে দেব?

— না থাক। ঘুম পাচ্ছে আমার।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে অপরেশ। কিন্তু ঘুম নেই তার চোখে। অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করতে থাকে ডানলোপিলোর আলিঙ্গনে। আর আশ্চর্য, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সরমা শোওয়ামাত্রই।

পাশের ঘরে শর্মিলারও কাটছে বিনিদ্র রাত্রি।

শমু আর রমু একই খাটে শোয়। দুই বোন। ছেলেবেলা থেকেই ওরা এভাবে শোয়। মাঝে অবশ্য বছরখানেক রমলাকে এ খাটে একা শুতে হয়েছে। রমলা ঘুমিয়ে কাদা। শর্মিলা ওর গায়ে চাদরটা টেনে দেয়। হাতটা বেকায়দায় ঝুলে পড়েছিল খাট থেকে। তুলে ঠিক করে দেয়।

—রমু, এই রমু, সরে শো। এতবড় মেয়ে ঘুমালে একেবারে কাদা।

রমলার ঘুম ভাঙে না তাতেও। ঠেলাঠেলিতে পাশ ফিরে শোয়। আধো ঘুমে আচমকা জড়িয়ে ধরে দিদির গলা। একেবারে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে সরে আসে ঘুম-কাতুরে মেয়েটা। শর্মিলা হাসে আপনমনেই বলে—শোয়ার কী ছিরি!

গলা থেকে হাতটা খুলে নেয়। ঘুমে-কাদা রমু টেরও পায় না। শর্মিলা উঠে পড়ে। এক গ্লাস জল খায়। ঘড়িটা একবার দেখে। রাত সাড়ে এগারোটা। বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটা দুটো যেন ঝগড়া করেছে। দুজনের মুখ দেখা-দেখি নেই।

শর্মিলা আস্তে আস্তে নিজের গলায় হাত বুলালো। এখনি কেমন আঁকড়ে ধরেছিল রমু ঠিক এই রকম শোওয়ার ধরন ছিল আনন্দের। ঘুমের মধ্যে এমন আচমকা জড়িয়ে ধরত যে দম বন্ধ হয়ে যেত। অবশ্য এ সবই প্রথম দিকে। বিয়ের পর শেষ দিকে ওরা এক বিছানাতে শুলেও মনে হত যেন দুজনে নদীর দু পারে আছে। কিন্তু প্রথম দিকে আনন্দ ছিল যেন অন্য আর এক রকম মানুষ। ছেলেমানুষ, খুশীয়াল, ফুর্তিবাজ। সেই, মানুষই কী হয়ে গেল মাত্র একটি বছরে। যেন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ, গম্ভীর নীরস। কিন্তু

না, সেই শেষের দিকে আনন্দের কথা আজ ভাববে না শর্মিলা। তাকে মনে করতে হবে প্রথম দিককার আনন্দকে। একটা বিশেষ রাত্রের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল শর্মিলার। ওরা তখন হুগলীতে। বিয়ের মাস দুই পরের কথা। আনন্দ প্রথম চাকরি পেয়ে যোগ দিয়েছে মহসীন কলেজে। শর্মিলাকেও নিয়ে গেছে। ফাঁকা মতন জায়গাটা। একতলা বাড়ি। দুখানি মাত্র ঘর। সামনের ঘরখানাকে গৌরবে বৈঠকখানা বলা হত বটে, আসলে সেটা ছিল বইয়ের গুদাম। আশ্চর্য বই-পাগল মানুষ আনন্দ মিত্র। রাজ্যের বই কিনে আনত সে অহরহ। যে কটা টাকা রোজগার করত তা থেকে বইয়ের পিছনেই ব্যয় হত বেশি। শর্মিলা কোন অনুযোগ করলেই বলত—ঠিক কথা, বিবাহের ব্যাকরণে এবম্বিধ নির্দেশ আছে বটে। 'ই'-স্থলে 'উ' আদেশ।

—তার মানে?

—মানে 'বই'য়ের পিছনে খরচ বন্ধ করে 'বউ'য়ের পিছনে খরচ করতে হবে।

তা সে কথা যাক। সেই বিশেষ রাত্রির কথাটাই এখন মনে করবে শর্মিলা। রোমন্থন করবে স্মৃতির সঞ্জীবনী। এখন তো সেইটুকুই ওর সম্বল। সে রাত্রেও শর্মিলার চোখে ঘুম ছিল না। আর সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত আনন্দ অঘোরে ঘুমোচ্ছে পাশে শুয়ে—ঠিক আজকের রমুর মত। সে রাতটাও ছিল আজকের মতো অন্ধকার। চাঁদ ছিল না আকাশে। না, আলো তো ছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঘরের সামনেই ছিল রাস্তা। সেখানে ছিল এক-পায়ে-খাড়া একটা ল্যাম্প-পোস্ট। সারারাত তাতে আলো জ্বলত। পুবের জানলা দিয়ে সেই রাত্রে লাইট-পোস্টের এক মুঠো আলো এসে ছড়িয়ে পড়ত ওদের মশারির গায়ে। আনন্দ বলত—চাঁদনী অর নো চাঁদনী, আমার ঘরে নিত্য পূর্ণিমা।

শর্মিলা বলত—মিউনিসিপ্যালিটি তোমার ট্যাক্স না বাড়িয়ে দেয়।

আনন্দ ছদ্ম বিস্ময়ে বলে তার মানে? তুমি কি ওই ল্যাম্প-পোস্টটার আলোর কথা ভাবছ বুঝি? আমি ও কথা বলছি না কিন্তু—

— তবে কী?

ওর গালটা টিপে দিয়ে আনন্দ বলেছিল—আমি এই পূর্ণিমার কথা বলছি।

নাঃ। আবার উল্টোপাল্টা ভাবনা শুরু হয়েছে। কী কথা ভাবছিল সে? ও হ্যাঁ, সেই বিশেষ রাতটার কথা। সে রাত্রেও ঘুম আসছিল না শর্মিলার চোখে। আর ঘুমেরই বা দোষ কী? এমন ঘরে এমন পরিবেশে সে কখনও ঘুমিয়েছে যে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবে? আনন্দের আর কী? সমস্ত দিন হয় পড়ছে নয় পড়াচ্ছে, হয় লিখছে নয় লেখাচ্ছে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক চালনার আর বিরাম নেই। ফলে খাটে এসে শুলেই একেবারে মড়া। অথচ প্রহরের পর প্রহর ঘুম আসত না শর্মিলার চোখে। ডাক শুনত ঝিঁঝি পোকার, শেয়ালের আর নিশাচর

চৌকিদারটার। সে রাত্রেও শুয়ে শুয়ে উসখুস করছে, হঠাৎ মনে হল বাইরের জানলার কাছে কিসের খুটখুট শব্দ। শর্মিলা চুপচুপি ডেকে দিয়েছিল আনন্দকে —এই, শুনছ? ওঠ, কিসের যেন আওয়াজ হচ্ছে।

তাতেও আনন্দের ঘুম ভাঙে না। শেষে একটা ঠেলা দিতেই ঠিক এই রমুর মতো আনন্দ ওকে আচমকা জড়িয়ে ধরেছিল। বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে আরাম করে শুয়েছিল।

—এই! আচ্ছা মানুষ তো! ওঠ, চোর এসেছে!

ঘুমের ঘোরে আনন্দ বলেছিল—চোর নয়, ছুঁচো।

—না না, তুমি উঠে দেখ একবার। আমার ভয় করছে। শুনছ?

—উঁ? চোর? আচ্ছা দেখছি। বলে, শুয়ে শুয়েই একটা হাঁক পেড়েছিল —অ্যাই চোর! ভাগ্! শব্দ করিস না, বউ ভয় পাচ্ছে।

শর্মিলা চাপা ধমকে গর্জে ওঠে—কী অসভ্যতা হচ্ছে। ও ঘরে উমা আছে না। উঠে দেখবে না, খালি শুয়ে শুয়ে চেঁচানো। ভারী অন্যায়।

ঘুমের ঘোরে আনন্দ সায় দেয়—অন্যায় বলে অন্যায়। বেটা চোর, চুরি করছিস কর, আবার শব্দ করা কেন!

শর্মিলা এক ধাক্কা মেরে বলে—কী হচ্ছে! চুপ কর না, চেঁচাচ্ছ কেন?

এবার ঘুমটা ভেঙে যায় আনন্দের। বলে—তুমি চেঁচাতে দিচ্ছ কেন? চুপ করিয়ে দিলেই পার।

—তার মানে?

তার মানে বোঝ না? আচ্ছা এই দেখ বুঝিয়ে দিচ্ছি। ক্ষমতা থাকে তো চেঁচাও দেখি।

—দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শর্মিলার। বাঁ হাতের চেটোয় মুখটা মুছে নিয়ে বলেছিল—অসভ্য কোথাকার!

মার ঘরে আলো জ্বলল।

আজ রাত্রে স্বাগতার চোখেও বোধ করি ঘুম নেই। খুটখাট শব্দ হচ্ছে তাঁর ঘর থেকে। পাশের ঘরে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ হল। শর্মিলা চাদরটা টেনে নেয়। চোখটা অল্প ফাঁক করে দেখে স্বাগতা এ ঘরের দিকেই আসছেন। হাতে টর্চ। ওদের বিছানার দিকে এগিয়ে আসছেন। শর্মিলা মড়ার মত পড়ে থাকে। যেন ঘুমে কাদা। স্বাগতা ওর মাথায় বালিশটা ঠিক করে দিয়ে ফের বেরিয়ে গেলেন। হ্যাভানা ঘাসের নরম চটির আওয়াজ মোজেইক মেজেতে শোনা যাচ্ছে, রাত এত নিস্তব্ধ। বাথরুমের দিকে চলে গেলেন মিসেস বোস।

শর্মিলা আপন মনেই হাসল। আশ্চর্য, সে কেন মড়ার মত পড়ে থাকল!

কেন জানতে দিল না মাকে, যে সে জেগে আছে। শর্মিলা কি মায়ের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে? না কি তিনি আজ সকালে আনন্দের চিঠিখানা না পড়েই পুড়িয়ে ফেলেছেন বলে এ অভিমান? আচ্ছা, সেই বা কেন মিছিমিছি রাগারাগি করতে গেল এভাবে? আনন্দের প্রতি তার তো আর কোন মমতা, কোন আকর্ষণ নেই। আনন্দের লেখা চিঠির বিষয়ে তো কোন কৌতূহল তার থাকার কথা নয়। সে-পাট তো সে চুকিয়েই দিয়ে এসেছে চিরকালের জন্য। যে ব্যবহার আনন্দ করেছে তারপর তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বোঝাপড়া করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দীর্ঘদিন তা সত্ত্বেও সে প্রতীক্ষা করেছিল, কিন্তু আনন্দের দিক থেকে কোন আহ্বান, কোনও সাড়া সে পায়নি। এমন কি সে হাসপাতালে গেল, ফিরে এল তবু কোনও খবর নেয়নি আনন্দ। ফলে সেই শেষ সাক্ষাতে যে কথাগুলো আনন্দ বলেছিল সেগুলোকে আর রাগের-মাথায়-বলা ফাঁকা কথা বলে উড়িয়ে দিতে পারেনি। আনন্দ মুক্তি চেয়েছিল। শর্মিলা তাকে মুক্তি দিয়েছে। শুধু কি তাই? শর্মিলাও যে মুক্তি চেয়েছিল। এতদিনে সে মুক্তি সেও পেয়েছে। ভুল ভুলই। দু পক্ষই সে ভুল বুঝতে পেরেছে। ভুল সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। অনেক ভেবেচিন্তে শর্মিলা সম্মতি দিয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থাপনায়। যে ভুলকে দুজনেই অস্বীকার করতে পারেনি, সে ভুলকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়াই ভাল। আচ্ছা ডিভোর্সের কথা কে প্রথম উচ্চারণ করেছিল? আনন্দ, না শর্মিলা? ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু আজ আর সে খতিয়ান হাতড়ানো নিষ্প্রয়োজন। মুখে যেই আগে উচ্চারণ করে থাক, এটা যে একমাত্র সমাধান তা দুজনে বোধ করি একই সঙ্গে উপলব্ধি করেছিল। শর্মিলা এতদিনে বিকাশের প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। বিকাশ আসছে। কালকেই তাহলে আবার কেন সে পুরানো অধ্যায় নতুন করে খোলা? না, ঠিক পুরানো অধ্যায় নতুন করে খোলা নয় শর্মিলা শুধু জানতে চায়, আনন্দ চিঠিতে কী লিখেছিল, কী তার বক্তব্য। দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ কী উদ্দেশ্য নিয়ে আনন্দ তার কাছে পাঠিয়েছিল চিঠি। যত যাই হোক বোঝাপড়াটা আনন্দ আর শর্মিলার। যা-কিছু সিদ্ধান্ত তা তারাই নেবে, আর কেউ নয়। মা-দাদারা পরামর্শ দিতে আসেন ভাল কথা; কিন্তু তাকে না জানিয়ে তার চিঠি পুড়িয়ে ফেলার অধিকার তো তাদের দেয়নি শর্মিলা। এ ওঁদের অধিকারবহির্ভূত বাড়াবাড়ি। এ অপরাধের শাস্তি দিতেও শর্মিলা জানে। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সে বলবে আজ দুপুরের ট্রেনে আমি একবার বহরমপুর যাচ্ছি।

মা চমকে উঠবে। আগুন-ঝরা চোখ দুটো মেলে বলবে, মানে?

—মানে যে চিঠিখানা হঠাৎ পুড়ে গেল, সেটায় কী লেখা ছিল জেনে আসি।

মা নিশ্চয় জবাব দেবে না। গুম মেরে বসে থাকবে। নিটিং-এর কাঁটায়

পরপর কয়েকটা ঘর পড়ে যাবে হয়তো। বউদির হাত থেকে খানিকটা চায়ের লিকার ছলকে পড়বে টেবিলক্লথে। রমু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে বোকার মতো। আর দাদা বলবে, তুই ক্ষেপেছিস শমু? না, সেখানে আর তোর যাওয়া চলবে না।

শর্মিলা বলবে, একদিন চিরকালের জন্য যখন চলে যেতে চেয়েছিলাম তখন বাধা দিয়েছিলে তোমরা। তোমাদের সে বাধা আমি মানিনি। আর আজ তো শুধু একবেলার জন্য যেতে চাইছি, দাদা। কেন মিথ্যে বাধা দিচ্ছ?

মা গর্জন করে উঠবে, যা ইচ্ছে হয় কর। কিন্তু তাহলে এ ভাবে বিকাশকে না নাচালেও চলত।

শর্মিলা বলবে, প্রথমত আমি চিরদিনের মতো যাচ্ছি না, দ্বিতীয়ত বিকাশকে আমি নাচাইনি— নাচাচ্ছ তোমরা। সে দায়িত্ব তোমাদের।

কিন্তু না, এ সব কী ভাবছে শর্মিলা? অহেতুক সে মায়ের সঙ্গে, দাদার সঙ্গে ঝগড়াই বা করতে যাবে কেন? একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বিবেচনা করলে কি শর্মিলা বুঝতে পারে না— কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলেছেন স্বাগতা? শর্মিলা তো তার দুর্বলতাকে এখনও অস্বীকার করতে পারে না। সে যে এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে, আনন্দের বদলে বিকাশ তার জীবনে এলেই সে সুখী হতে পারবে। বিকাশ বড়লোক। কিন্তু কে জানে অভাবের মতো প্রাচুর্যও সুখী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিনা। দুদিন আগেও সে রাজী ছিল না বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থায়। পনের দিন আগেও প্রত্যাখ্যান করেছে বিকাশের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতভরা চিঠি। আজ, হ্যাঁ আজ সে রাজী হয়েছে। উপায়ান্তর-বিহীন হয়েই সে রাজী হয়েছে। সমাজে সে আর মুখ দেখাতে পারছে না। দাদা-মা-রমু ক্রমাগত তার কানে মন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। নতুন কোন বন্দরে যদি জাহাজ ভিড়াতেই হয়, তাহলে দেরি করাও আর উচিত নয়। যৌবন কারও অভিমানের অপেক্ষায় বসে থাকে না। দীর্ঘ আত্মসমীক্ষার পরে সে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে এতদিনে। বুঝেছে, আনন্দকে নিয়ে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তা বুদ্বুদের উপরের বর্ণচ্ছটার মতোই অলীক। তাকে মুঠোয় করে ধরা যায় না। ঘর বাঁধবার উপকরণ নেই আনন্দের ভালবাসায়। আর সে ভালবাসাটাই বা রইল কোথায়? আনন্দ জন্ম-উদাসী। খেয়ালী। চেষ্টার তো ত্রুটি করেনি শর্মিলা। বুঝিয়েছে নানানভাবে, বুঝতে দিয়েছে তাকে। দাম্পত্যজীবন একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট, একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া। দুটি ভিন্ন সত্তা, তারা দুনিয়ায় এসেছে ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন পরিবেশে— ভিন্ন ভিন্ন পথে তাদের পরিক্রমা, তবু জীবনের খানিকটা পথ, অন্তত সাতটা পদক্ষেপ তারা একই তালে একই ছন্দে অতিক্রম করবে—এই হচ্ছে দাম্পত্যজীবনের অঙ্গীকার। তুমি লেখাপড়া ভালবাস,

তুমি ইতিহাসে পুরাবৃত্তের অন্ধকার অলিতে-গলিতে পথ হাতরে বেড়াতে আনন্দ পাও। ভাল কথা। বেড়াও। সে গলির মোড়ে তোমাকে হাত ধরে পৌঁছে দেব আমি। দাঁড়িয়ে থাকব সেই অন্ধকার অচেনা গলির সামনে তোমার প্রতীক্ষায়, কখন তুমি ফিরে এসে আবার আমার হাত ধরবে বলে। কিন্তু আমিও যে আমার মতো করে অনেক কিছু ভালবাসি। আমি গল্প করতে ভালবাসি, হাসতে ভালবাসি,—শাড়ি-গহনার নূতন নূতন প্যাটার্নের বিষয়ে আমার আছে অনুসন্ধিৎসা—সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের, সদ্যমুক্ত ছায়াচিত্রের উৎকর্ষতা নিয়ে আলোচনায় আমিও যে আনন্দ পাই। তুমি যখন ঐ আমার অচেনা গলিটা থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরবে তখন আমিও কেন আশা করব না আমার আনন্দলোকেও তুমি আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে? তোমার পাণ্ডুলিপির অ্যাপেন্ডিক্স আর সূচীপত্র যদি আমি করে দিতে পারি—তাহলে তুমিও আমাকে নিয়ে সিনেমা যাবার সময় পাবে না কেন?

আনন্দ অন্ধ হয়ে গেছে—মা দাদার কাছে এটাই সবচেয়ে বড় যুক্তি। হয়তো বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার বিচারকও সেটাকেই বড় করে দেখবেন। কিন্তু শর্মিলা তো জানে সেটা কোন বাধাই নয়। যে আনন্দকে সে প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে চিনত—সেই ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দেখা আনন্দ, সেই আউট্রাম ঘাটের ধারে বসা আনন্দ, সেই কফি-হাউসের আনন্দ যদি আজ ফিরে আসে তাহলে তার অন্ধত্বকে তুচ্ছ করে শর্মিলা লুটিয়ে পড়তে রাজী আছে তার পায়ে। কিন্তু তা আর হবার নয়। আনন্দ আবার নূতন করে অন্ধ হবে কি? সে তো জন্মান্ধ! মাঝে প্রেমের যাদু-শলাকার স্পর্শে মাত্র কয়েকটা মাস সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। তার আগে আর পরে শুধু ঘোর অন্ধকার!

কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় কথা আছে। সে কথা আজও কেউ জানে না। আর সেই জন্যেই আজ বিনা আহ্বানে শর্মিলা গিয়ে দাঁড়াতে পারে না ঐ অন্ধ মানুষটার সামনে। আনন্দ এখন তাকে দেখতে পাবে না তবু সেই অন্ধ দৃষ্টির সামনে লজ্জায় সংকোচে কুঁকড়ে যাবে শর্মিলা। কিন্তু তার কী দোষ? তুমি জেদ করে যদি আগুনে হাত বাড়াও তাহলে যেহেতু আগুনটা আমি জেলেছি তাই আমিই দায়ী? তোমার জেদ দায়ী নয়? উল্টোটাও তো হতে পারত—আনন্দ এ আগুন থেকে অক্ষত শরীরে ফিরে এসে যদি শুনত শর্মিলা হাসপাতালে মরতে বসেছে? কে দায়ী হত তখন?

আচ্ছা, উমা কি সব কথা জানে? নিশ্চয়ই জানে। শর্মিলা নিজে অবশ্য সে কথা আজও কাউকে বলেনি। রমুকেও নয়, মাকেও নয়। বউদির গলায় ঐ জড়োয়া হারটা দেখলে আজও সে শিউরে ওঠে। হারের দু'দিকে দুটো নীল পাথর আছে। সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না শর্মিলা। মনে হয় নীলা তো নয়—ও দুটো মানুষের চোখের মণি! এ কথা কাউকে বলা যাবে না।

বিকাশকেও সে জানতে দেবে না সারাজীবনে। কিন্তু আনন্দ কি সে কথা এত সতর্কভাবে গোপন রেখেছে? কেন রাখবে? সে তো সহানুভূতির কাঙাল এখন। অন্তত উমার কাছে সে সব কথা নিশ্চয় খুলে বলেছে। আর তাই উমা ছুটে এসেছিল কৈফিয়ত নিতে। আর ঠিক সেই কারণেই শর্মিলা সেদিন শত চেষ্টাতেও তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

মাস আষ্টেক আগের কথা। মানে শর্মিলা চিরদিনের মতো আনন্দের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে আসার মাস কয়েক পরের ঘটনা। পর পর তিন-চারখানা চিঠি লিখেও জবাব না পেয়ে উমা নিজেই এসেছিল। উমা শর্মিলার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, রমুর বয়সী। আনন্দের বড় আদরের বোন। সে এসেছিল নিউ আলিপুরের এই বাড়িতে। বসেছিল দোতলার ড্রয়িংরুমে। মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে গিয়েছিল। শর্মিলার দেখা সে পায়নি। শর্মিলা দেখা করেনি। স্বাগতা মেয়েকে যেতে দেননি। বলেছিলেন, যা বলার তা আমিই বলব। বলেও ছিলেন তাই।

মা পরে শর্মিলাকে বলেছিলেন, দূর সম্পর্কের কে এক দাদামশাইকে নিয়ে এসেছিল উমা। শর্মিলা জানে তিনি আর কেউ নন, রত্নেশ্বর মিত্র—রতনদাদু। শর্মিলা স্বচক্ষে দেখেনি, কিন্তু আন্দাজ করতে পারে। রতনদাদু ছাড়া আর কে-ই বা আসবে?

স্বাগতা ঘরে ঢুকতেই উমা এসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। বলেছিল—ভাল আছেন তো মাঐমা?

উত্তরে স্বাগতা বলেছিলেন—তুমি বুঝি আনন্দ মিত্তিরের বাড়ি থেকে আসছ?

উমা চমকে ওঠে। মাঐমা কি তাকে চিনতে পারছেন না নাকি? কিন্তু তিনি তো এর আগেও তাকে দেখেছেন, কথা বলেছেন। আনন্দের একটি মাত্র বোন, এত শীঘ্র ভুলে গেছেন তিনি? একটু অবাক হয়ে বলে—আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি উমা।

স্বাগতা এ প্রশ্নের জবাব দেননি। পিয়ানোর উপর লেসের ঢাকনাটা হাওয়ায় সরে নড়ে গিয়েছিল। সেটাকে ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন হঠাৎ।

উমা খুব কিছু লেখাপড়া শেখেনি। তবু বোকা সে নয়, এটুকু বুঝতে পারে এটা নিছক একটা বড়লোকি চাল। অবজ্ঞা প্রকাশের অভিব্যক্তি। বসতে তাকে কেউ বলবে না। সে যে স্টেশান থেকে ট্যাক্সি করে সোজা এসেছে এ খবরটা স্বাগতার না-জানা থাকার কথা নয়। যে চাকরটা খবর দিতে গিয়েছিল সে সেটা দেখেই ভিতরে গেছে। একতলায় ট্যাক্সি থেকে রতনদাদু মালপত্র নামাচ্ছেন, আর অনায়াসে উমা উঠে এসেছিল দ্বিতলে, বিনা আহ্বানে। কুটুম বাড়ি—সে ইতস্তত করেনি। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল সে এতক্ষণে।

মরিয়া হয়ে বলে—বউদি কোথায় ?

ঘুরে দাঁড়ালেন স্বাগতা, বউদি মানে ? কার কথা বলছ ?

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে উমার। গ্রামের মেয়ে সে, ঝগড়া করতে পিছপাও নয়। দাদার এই বিধবা শাশুড়ীটিকে সে কোন দিনই সুনজরে দেখেনি। এই আধুনিকা বিধবা মহিলাটির সাজ-পোষাক, হাবভাব কিছুই তার ভাল লাগত না। এই ন্যাকামি দেখে সে আর স্থির থাকতে পারে না, বলে—বউদি মানে আমার দাদার স্ত্রী। আপনার মেয়ে শর্মিলার কথা বলছি।

ভ্রূ কুঁচকে স্বাগতা বলেছিলেন—কিন্তু সেকি তোমাদের বাড়ি ছেড়ে আসার সময় বলে আসেনি যে, পুরানো সম্পর্কের জের সে টেনে চলতে চায় না ?

উমাও কম যায় না। অতটুকু মেয়ে হলে কি হবে, কোণঠাসা হলে খরগোশও ফিরে আক্রমণ করে। মরিয়া হয়ে বলে—অতবড় ব্যারিস্টারের বউ হয়ে আপনি এমন বেফাঁস কথাটা বললেন ? রেজেস্ট্রি-ম্যারেজের সম্পর্ক কি কারও খেয়াল খুশিতে উপে যায় ?

এতক্ষণে স্বাগতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি বলে বসেন—তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। সম্পর্কেও। যদি ভদ্রভাবে কথাবার্তা না বলতে শিখে থাক—

বাধা দিয়ে উমা বলেছিল—সম্পর্কেও! সম্পর্ক তা হলে কিছু একটা আছে ? তা স্বীকার করে নিলেন ?

ব্যারিস্টারের বউ কে ? কথার প্যাঁচে এক ফোঁটা মেয়েটা তাঁকে এভাবে নাজেহাল করবে নাকি ? মিসেস বসু একটা আগ্নেয়গিরির মতো ফেটেই পড়তেন হয়তো। কিন্তু তার আগেই মিষ্টি হাসি হেসে উমা বলে—দেখুন, আমি এতটা পথ এসেছি বউদির সঙ্গে দেখা করে যাব বলে। আমার দাদা অত্যন্ত অসুস্থ, বউদির সঙ্গে দেখা না করে, সব কথা না বলে আমি তো ফিরে যাব না।

স্বাগতা এ দৃঢ়সংকল্পর সামনে কেমন যেন অসহায় বোধ করেন। তাড়াতাড়ি একখণ্ড মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মগোপনে প্রয়াসী হয়ে পড়েন—শমু বাড়ি নেই।

কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে মরমে মরে গিয়েছিল শর্মিলা। ছি ছি ছি! মা কেন মিছে কথা বলতে গেল ? সম্পর্ক যদি ছিন্ন করতেই হয়, তা হলে এ লুকোচুরির কী দরকার। এড়িয়ে গেলে তো চলবে না। সামনা-সামনি এসে বলতে হবে সব কথা। বলতে হবে—হ্যাঁ, ব্যারিস্টারের বউ ভুল করলেও ব্যারিস্টারের মেয়ে ভুল করবে না। সামাজিক সম্পর্কটা কীভাবে ছিন্ন করতে হয় তাও জানা আছে তার। আদালত থেকে যথাসময়ে সে নির্দেশ পাবে

তোমরা। কিন্তু কিছুতেই পর্দা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকতে পারেনি। পা দুটো যেন মেঝের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। না, মায়ের ভয়ে নয়—মায়ের মিথ্যা কথাটা ধরা পড়ে যাবে বলে নয়—শর্মিলার মনে হয়েছিল, উমা বোধ হয় সব কথা জানে। আনন্দ নিশ্চয়ই তাকে সব কথা খুলে বলেছে এতদিনে। আর সেই জোরেই উমার আজ এত তেজ। বাড়ি বয়ে ঝগড়া করতে এসেছে। না হলে স্বাগতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অমন বাঁকা-বাঁকা কথা বলার সাহস সে পায় কোথা থেকে? শর্মিলা ঘরে ঢুকলেই উমা জ্বলে উঠবে একেবারে। সরাসরি কৈফিয়ত তলব করে বসবে। বলবে—তুমি, তুমিই উপড়ে নিয়েছ আমার দাদার দুটো চোখ! আর তাই দিয়ে সাজিয়েছ তোমার বউদিকে! তাই আজ আমার দাদা অন্ধ! তুমি পালাবে কোথায়? দাদা আমাকে সব কথা খুলে বলেছে। যা ক্ষতি করে গেছ আমাদের তার খেসারত মিটিয়ে দাও আগে—তারপর সম্পর্ক মান ভালো, না মান, না। তখন কী জবাব দেবে শর্মিলা? যে-কথা আজও বাড়ির কেউ জানে না, সে কথাটা আছড়ে পড়বে ঘরের মেঝেতে। ছড়িয়ে পড়বে সেই মুখরোচক খবরটা নিউ আলিপুরের এ-বাড়ি থেকে সে-বাড়িতে। এ-পাড়া থেকে সে-পাড়ায়। তারপর যে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না শর্মিলার। মরতে আপত্তি নেই, কিন্তু কী অবমাননাকর হবে সে আত্মহত্যা! কিন্তু তার কী দোষ? সে তো সত্যিই দায়ী নয় আনন্দের আজকের এ দশার জন্য।

কিন্তু পরবর্তী কথোপকথন কানে যেতে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল শর্মু। উমা হেসে আবার বলেছিল—সত্যিই যদি বউদি বাড়ি না থাকত তাহলে আমি এখানে আপেক্ষা করতাম। আপনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেও বসে থাকতাম ফুটপাতের উপর, যতক্ষণ না সে বাড়ি ফেরে। কিন্তু মাপ করবেন মাঐমা, ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় আমি যে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি তাকে বারান্দায়। তাকে ডেকে দিন, বলবেন, বেশি সময় আমি নেব না।

স্বাগতা বললেন—তবে তো বুঝতেই পারছ সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না, কথা বলতে চায় না। বলবে না।

উমা চুপ করে গিয়েছিল। এ কথার জবাব নেই।

ঠিক এই সময়েই রতনদাদু এক হাতে মিষ্টির হাঁড়ি, অন্য হাতে একটা স্যুটকেশ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। উমা তার অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ আক্রোশ ঐ নিরীহ বৃদ্ধের উপর ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠেছিল, এগুলো আবার নামাতে গেলে কেন দাদু? তোমার কি কোনকালেই বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না?

ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ।

—এঁরা আমাদের চিনতে পারছেন না। চল, স্টেশনেই ফিরে যাই।

রতনদাদু অবাক বিস্ময়ে একবার উমা একবার স্বাগতার দিকে তাকিয়ে

বলেছিলেন—চিনতে পারছেন না ! তাই তো ! তা এঁরা না চিনুন, বউমা তো চিনবেন। তিনি কই ?

ঝাঁজিয়ে উঠেছিল উমা—না, তোমার বউমাও চিনতে পারছেন না আমাদের।

রতনদাদু সাদাসিদে ভালমানুষ। তা হলেও ভিতরকার ব্যাপারটা কিছু কিছু জানা ছিল তাঁর। তিনি আনন্দের সম্পর্কে দাদু হন। আনন্দের পৈতৃক ভিটায় বহরমপুরেই থাকেন। নাতবউকে সত্যিই স্নেহ করতেন তিনি। আনন্দ বউ নিয়ে একবার কিছুদিন তার পৈতৃক ভিটায় গিয়ে বাস করেছিল। সেই স্বল্প পরিচয়েই বৃদ্ধ ভালবেসে ফেলেছিলেন তাকে। বড়লোকের মেয়ে বলে মনেই হয়নি তাঁর। অপরেশের বিয়ের সময় তিনি এর আগেও একবার এসেছিলেন এ বাড়িতে, সেবারও নাতবউ তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন; কাছে বসিয়ে খাইয়েছিলেন। গল্প করেছিলেন। সেই বউমা আজ তার রতনদাদুকে একেবারে চিনতেই পারবে না, এটা মেনে নিতে পারছিলেন না বৃদ্ধ। কোনক্রমে বলেন—তা বউমার সঙ্গে একবার দেখাও কি হবে না ?

স্বাগতাকে আর পরিশ্রম করতে হয়নি। উমাই তাঁর হয়ে জবাব দিয়ে দেয় - সে কথা আর কী করে তোমাকে বোঝাব বল ?

রতনদাদু টাকের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—তাইতো, এখন ট্যাক্সি পাওয়াও তো হাঙ্গামা হবে। তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে এ ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দেওয়া ভুল হয়েছে আমার। কিন্তু, মানে এঁরা যে আমাদের একেবারে চিনতেই পারবেন না সেটা আমি ঠিক···

টাকের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বৃদ্ধ মাঝপথেই থেমে পড়েন।

হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় বলে বসেন—যাক, চল তাহলে যাওয়া যাক। তারপর উমার পরামর্শ না নিয়েই আবার করে বসেন এক কাণ্ড। সন্দেশের হাঁড়িটা স্বাগতার সামনে নামিয়ে দিয়ে বলেন—যা হোক, এটা রাখুন। নাতবউয়ের নাম করে এনেছিলাম, বলবেন তার রতনদাদু দিয়ে গেছে।

স্বাগতা শান্তিস্বরে শুধু বলেছিলেন—না, ওটা আপনি নিয়ে যান।

স্বাগতার সেই কণ্ঠস্বর যাকে এ-বাড়ির কেউ অমান্য করবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধের উপর এ অমোঘ আদেশ কোন প্রতিক্রিয়াই করল না। বিরলকেশ বৃদ্ধটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—সেটা আর পেরে উঠব না মিসেস বোস। যে অপমানের বোঝাটা চাপিয়ে দিয়েছেন কাঁধে, তাই বইতেই এ বুড়োর পা টলছে। সে বোঝার উপর ওই শাকের আঁটিটা আর বইতে পারব না। আর তা ছাড়া ওটা তো আপনাকে দিচ্ছি না আমি। আমার নাতবউকে দেবেন আঁস্তাকুড়ে টেনে ফেলে দিতে হয় তা তিনিই দেবেন। এস উমা।

উমা অবাক হয়ে গিয়েছিল। নির্বাক নির্ঝঞ্ঝাট ভালমানুষ বলে যাকে জানা ছিল এতদিন, সেই রতনদাদুর মুখে এ ভাষা যেন আশাই করেনি। মন্ত্র-চালিতের মতো সে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে একতলায়।

ও-অধ্যায়ের ঐখানেই শেষ। তারপর আজ প্রায় দীর্ঘ এক বছর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি ও-তরফ থেকে। এতদিন পরে যদিও বা এল একখানা চিঠি—মা সেটা পড়তেই দিল না।

কিন্তু একটা কথা। চিঠিটা তো আনন্দ স্বহস্তে রচনা করেনি। আনন্দ আজ দৃষ্টিহীন। স্বহস্তে চিঠি লিখবার ক্ষমতা তার নেই। তাহলে কাকে দিয়ে লিখিয়েছিল সে? রতনদাদু? না, উমা? যাকে দিয়েই লেখাক সংযত ভাষায় বক্তব্য বলতে হয়েছে তাকে। কানে কানে ডাকার সেই বিশেষ নাম ধরে সম্বোধন করেনি নিশ্চয়। আচ্ছা, আনন্দ যদি আজ দৃষ্টিহীন না হত, তাহলেই কি সেই বিশেষ নামে পাঠ লিখত সে? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শমুর এ মধ্যরাত্রে। কে জবাব দেবে এ প্রশ্নের?

সে প্রশ্নের জবাব আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

আশ্চর্য মানুষ ছিল আনন্দ। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেও যেন নিস্তার নেই শর্মিলার। শেষ দিকের আনন্দ নয়, সেই প্রথম যুগের আনন্দ এখনও মধ্যরাত্রে আসে ওর ঘুম কেড়ে নিতে। আজও সারারাত ধরে সে কি শুধু আনন্দের কথাই ভাববে না কি? হ্যাঁ, তাই ভাববে। এই শেষ। কাল সকালেই এসে পড়বে বিকাশ। সে প্র্যাকটিকাল মানুষ, প্র্যাগম্যাটিক। কিন্তু ঠিক কি তাই? শর্মিলা যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে আনন্দের কাছে ধরা দিল তখন বিকাশ কোন অনুযোগ করেনি। নিঃশব্দে সে সরে দাঁড়িয়েছিল। স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে গিয়েছিল দিল্লিতে, নিজে তদবির করে। তবু আশ্চর্য, অন্য কোন মেয়েকে সে বিয়ে করেনি। সমাজে মেয়ের তো আর অভাব নেই। অভাব নেই মেয়ের চাইতে তাদের মা-দের। তারা উত্যক্ত করে তুলেছিল বেচারি বিকাশকে। দোষের মধ্যে তার চেহারা হ্যান্ডসম, পৈতৃক সম্পত্তি ততোধিক হ্যান্ডসম। এই দোষে শেষ পর্যন্ত বেচারিকে দেশত্যাগী হতে হয়েছিল। সে আজও প্রতীক্ষা করে আছে। শর্মিলা তাকে অস্বীকার করবে কেমন করে? 'উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে!' তা ঠিক। তবু আজকের এই রাতটিকে সে শেষবারের মত খরচ করবে নিজের খেয়ালখুশি মতো। করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষভরে শেষবারের মত পান করবে সারারাত। কাল সকাল থেকে সে হবে অন্য মানুষ। বিকাশ, আজকের রাতটুকুর জন্য শর্মিলাকে তুমি ক্ষমা কর। ওর জীবনের একটি বছর যদি তুমি অস্বীকার করতে পার, তবে তার সঙ্গে এই একটি রাত্রিকেও তুমি অগ্রাহ্য কর। এ সব অবান্তর চিন্তা আর সে কোনদিন করবে না। এই একটি রাত্রের মতো তুমি ওকে মুক্তি দাও!

ও একবার আপাদমস্তক অবগাহন করে নিতে চায় শেষবারের মতো স্মৃতির ঘারাস্নানে।

ঘুম-না-আসা রাতে প্রথম প্রেমে স্মৃতির রোমন্থন করেছ কখনও? কিছুটা মনে পড়ে। কিছুটা পড়ে না। কিছুটা আবছা, কিছুটা উজ্জ্বল। কয়েকটা ভুলে-যাওয়া কথার নূতন করে পাদপূরণ। মনে হয় বয়সটা পিছিয়ে গেছে মন্ত্রবলে। দেহটা পড়ে থাকে বিছানায়— দেহমুক্ত মন স্মৃতির সরণি বেয়ে আবার ডুব দিয়ে আসে প্রথম প্রেমের ঝরণাধারায়। শিরশির করে ওঠে সারা শরীর, চোখ মুদে আসে আবেশে। এক একটা দিন, এক একটা মুহূর্ত যেন ফিরে এসে বলে আমার কথা ভোলনি দেখছি। তারপর কখন তন্দ্রাতুর স্মৃতিচারণ হঠাৎ থেমে যায়। ফিরে আসে বাস্তবে, বর্তমানের কালে। বালিশটা ভেজা। নূতন করে শুনতে পাও রাত্রিচর দেওয়াল-ঘড়িটার টক্-কারী।

আনন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ। এ নিয়ে আনন্দ যে কতবার কত প্রসঙ্গে ঠাট্টা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বন্ধু-বান্ধবদের জনে জনে শুনিয়েছে এ কাহিনী শর্মিলার উপস্থিতিতে। শর্মিলা রাগ করে বলত—এক গল্প আর কতবার শোনাবে?

আনন্দ দমবার পাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ বলত—এটা যে ক্লাসিক পর্যায়ের গল্প। পুনাবৃত্তিতে তো এর রসাভাব হওয়ার কথা নয়।

আনন্দের মুখে বারে বারে শুনে ঘটনার বিন্যাসগুলো শর্মিলা এখনও আনন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পায়। মনে পড়ে যায় তার গল্প করার দৃশ্যটা, বন্ধুমহলে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে শমুর দিকে তাকানোর ভঙ্গি। শমু নিজে যে ঐ খণ্ডকাব্যের নায়িকা তা যেন তখন আর মনে থাকে না।

আনন্দ তখনও তার থিসিস্ জমা দেয়নি। ছাত্রই সে। বছর চব্বিশ বয়স। থাকে বাদুড়বাগানের এক মেসে। সারাদিন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী আর জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়ে থাকে। দোহারা চেহারা, চুলগুলো উশকোখুশকো, অযত্নলালিত। চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা। কাচটা ফ্রেমের চেয়েও মোটা। সাধারণত পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে থাকতে সে ভালবাসে। কাঁধে ঝোলে গেরুয়া রঙের একটা শান্তিনিকেতনী কাজকরা ব্যাগ। তার মধ্যে ওর নথিপত্র। কিছু সাদা কাগজ, কিছু লেখা, দু একটি বই ও নোট বই। শর্মিলা তখন প্রেসিডেন্সীতে পড়ে, সেকেন্ড ইয়ার। সকালবেলা আলিপুর থেকে গাড়ি করে কলেজে আসে, আর বিকালে আবার বাড়ির গাড়িতেই ফিরে যায়। কোন কোনদিন বাড়ির গাড়ি যায় না, সেদিন ট্যাক্সি করে। বিকাশ তখনও আসতে শুরু করেনি ব্যারিস্টার বোসের বাড়িতে।

সেদিন আকাশ জুড়ে নেমেছিল বৃষ্টি। বৃষ্টি-বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আর তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে

অনেকক্ষণ। বাসে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। রাস্তাঘাটে হাঁটুজল। মটোর গাড়ির উৎক্ষিপ্ত জলের আক্রমণ থেকে বাঁচবার প্রেরণায় হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জুতো-হাতে পথচারীর দল সন্তর্পণে পারাপার হচ্ছে রাস্তা। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া পথে নামছে না মানুষ। বাজার-হাট বসেনি। ঘরে ঘরে বোধ করি খিচুড়ি। পার্কের রেলিঙে একজোড়া ভিজে কাক। পালকের মধ্যে ঠোঁটের খোঁচা মেরে গা সাফা করছে। রাস্তার ওপাশে হিন্দু স্কুলের রোয়াকে বসে দুটি ছেলে কাগজের নৌকা ভাসাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে বেরিয়ে একটা কার্নিশের তলায় প্রথম দফায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল আনন্দকে। সেই জলেভেজা পায়জামা আর পাঞ্জাবি— কাঁধে সেই গেরুয়া রঙের ব্যাগ। মোটা চশমার কাচে বার বার জল লেগে যায়। খুলে মুছে চোখে দিতে হচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে। আনন্দ একবার রাস্তার দিকে, একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। কালো কালো মেঘে আকাশ এখনও ছেয়ে আছে— অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি। কলেজ স্ট্রীটে, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীটে বইয়ের দোকান বসেনি; ফুটপাতের উপর সামুদ্রিক জ্যোতিষের ছক কেটে তিলকধারী যে বৃদ্ধটি তীর্থের কাকের মতো রোজ বসে থাকে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মূর্তির কাছাকাছি, সেও এ সমুদ্রে হারিয়ে গেছে কোথায়। মনে হচ্ছে সারা বঙ্গোপসাগর বুঝি আকাশপথে তেড়ে এসেছে কলকাতা শহরকে ভাসিয়ে দেবে বলে।

আনন্দের জরুরী কাজ ছিল। কাল পরশু ছুটি। ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে রিজার্ভে রাখা বই দুটি ইস্যু করিয়ে না নিলে ছুটির দিন-দুটোয় পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে। কিন্তু কোথায় কলেজ স্ট্রীট আর কোথায় সেই আলিপুর। মাঝখানে এই মহাসমুদ্র। যাবে কেমন করে? হ্যারিসন রোডের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালে হয়। ওখানে বাসগুলি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। যদি সম্ভব হয় বাসের রডের সঙ্গে 'একটুকু ছোঁওয়া লাগে' সম্পর্ক পাতাতে। যদি সার্থক হয় বাসের পাদানির উদ্দেশে গাওয়া প্যারডি 'চরণ রাখিতে দিও গো আমারে, দিও না দিও না ফিরায়ে।'

একটা উজানগামী ডবলডেকার কাকে-খাই কাকে-খাই করতে করতে বেরিয়ে গেল জল কেটে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই তাতে। ঘরমুখো মানুষগুলো বেপরোয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঝুলতে ঝুলতে চলেছে বাসের হাতল ধরে। যে কোন মুহূর্তে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি হলে অবধারিত মৃত্যু। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই যেন ওদের। ওরা কি সবাই অভিসারে চলেছে? বিল্বমঙ্গলের মতো সর্পে রজ্জুভ্রম হলেও খেয়াল নেই। না হলে বাসের ওই চকচকে মৃত্যুদণ্ড ধরে কেমন করে ঝোলে ওই ঘরে-ফেরা মানুষগুলো? মনে মনে হাসল আনন্দ—এই কলকাতা শহর, এই মধ্যবিত্তের সংসার। এই সংসারের প্রেমে মানুষগুলো নিত্য দু বেলা বিল্বমঙ্গল সাজে।

হঠাৎ এ দার্শনিক চিন্তায় বাধা পড়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দ। এ কী! খালি ট্যাক্সি! হ্যাঁ, তাই তো!

ট্যা—ক্—সি!

আশ্চর্য কাণ্ড। ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সিটা ফুটপাতের কিনারে। আনন্দ তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার আগেই দুপাশ থেকে দুজন ছুটে এসে দুদিকের দরজার হাতল চেপে ধরে। বেচারী আনন্দ! এসব বিষয়ে সে চিরকালই অপটু। শান্তিপ্রিয় মানুষ। পিছিয়ে আসে সে। দুপাশের দুজন ততক্ষণে বচসা শুরু করে দিয়েছেন। ট্যাক্সির সাময়িক মালিকানা নিয়ে। দুজনেরই বক্তব্য তিনি আগে ডেকেছেন। শেষ পর্যন্ত একজন বলেন, বেশ তো মশাই ড্রাইভারকেই জিজ্ঞাসা করুন না কার ডাকে সে পার্ক করেছে গাড়ি।

—করুন, তাই করুন। দ্বিতীয় জন সালিশিটা মেনে নেয়।

আর অম্লানবদনে ছোকরা ড্রাইভারটি বলে বসে যাঁর ডাকে গাড়ি থামিয়েছি তাঁকে তো কাছেই ভিড়তে দিচ্ছেন না আপনারা দুজন। আনন্দকে দেখিয়ে দেয় ছেলেটি।

ঠিক এই সময়েই আর একটি উপচীয়মান দ্বিতল দৈত্যযান এসে স্টপেজে ভিড়ল। কয়েকজন নামছেন, দুজন প্রতিযোগীই রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটলেন সেদিক পানে। আঃ বাঁচা গেল। ট্যাক্সিটার উপর এখন আনন্দের নিরঙ্কুশ অধিকার। ছেলেটি বলে—চটপট উঠে পড়ুন স্যার, নাইলে আবার কোন্ ভেজাল জুটে যাবে। যাবেন কোথায়?

—আলিপুর। কিন্তু তোমার পিছনের সীটটা আর ভিজাব না আমি।

ড্রাইভারের পাশেই উঠে বসে আনন্দ। জুতো জোড়া ছিল হাতে, নামিয়ে রাখে পায়ের কাছে। ট্যাক্সিচালক বাঙালী। অল্প বয়স। ন্যাকড়া দিয়ে সামনের কাচখানা মুছতে মুছতে বলে খুব তাড়াতাড়ি আছে স্যার?

—না। কেন বলতো?

—এক কাপ চা গিলে নিতুম তাইলে। হাত পা সব যেন কালিয়ে গেছে।

—বেশ তো, খেয়ে নাও। এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমার। ঐ তো চায়ের দোকান।

—বাঁচালেন স্যার। বাসস্টপ বাঁচিয়ে গাড়িটা পার্ক করে ছোকরা ড্রাইভার হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ছপ্ ছপ্ করে জল ভেঙে এগিয়ে যায় চায়ের দোকানের দিকে।

—আরে তোমার মিটারটা নামিয়ে দিয়ে যাও।

আবার ফিরে আসে ছেলেটি। দরজার উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ভিজতে ভিজতে বলে—এটা কী রকম কথা হল স্যার? আমি খাব চা, আর ট্যাক্সির

মিটার উঠবে আপনার ? এতটা অকৃতজ্ঞ ভাববেন না আমাকে।

—ও আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। যাও যাও, আর ভিজো না শুধু শুধু।

জল কাদা ভেঙে ছেলেটি এক ছুটে চলে যায় চায়ের দোকানের দিকে। উপরে পানবিড়ির দোকান, নিচে চটের ঝাঁপ ফেলা চায়ের আয়োজন। তোলা উনুনে ভাঁড়ের চা। চটের পর্দা সরিয়ে ছেলেটি ঢুকে যায় ভিতরে।

নাঃ। পাঞ্জাবিটা একেবারে ভিজে গেছে। আনন্দ একটু ইতস্তত করে খুলে ফেলে সেটা। মেলে দেয় সীটের উপর। বৃষ্টির ছাঁট আসছে বাঁ দিক ঘেঁষে। কাচটা তুলতে গিয়ে দেখে সেটা ভাঙা। সরে এল ডাইনে—প্রায় স্টিয়ারিঙের মুখোমুখি। ভিজে পাঞ্জাবির পকেট থেকে উদ্ধার করে চারমিনারের প্যাকেটটা। আর দেশলাই। রুমালে জড়ানো ছিল বলে ও দুটো খুব কিছু একটা ভেজেনি। আশা আছে বাকি কটা সিগ্রেট খাওয়া চলবে। বহু আয়াসেও কিন্তু জলল না ভিজে দেশলাই। ক্রমে আনন্দ বিরক্ত হয়ে ওঠে। হাতের তালুতে ঘষে ঘষে তৃতীয় কাঠিটা জ্বালাবার উপক্রম করতেই খুট করে শব্দ হল পিছনে। সবে জ্বলেছে কাঠিটা। সন্তর্পণে সিগ্রেটটা ধরাতে যাবে, পিছনের সীট থেকে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হল— নিউ আলিপুর।

যাঃ! কাঠিটা নিবে গেল।

বিরক্ত মুখটা আর ঘোরাতে হল না। সামনে ড্যাসবোর্ডের উপরে লটকানো ছোট্ট আয়নাটায় ফুটে উঠেছে পশ্চাদ্‌পটের দৃশ্য। দেখা যাচ্ছে পিছনের সীটে বসে আছেন একজন আধুনিকা। নোটের খাতা আর কী একখানা চটি বই রেখেছেন সীটের পিছনে উঁচু খাপটায়। হাতব্যাগ খুলে একটা রুমাল বার করে হাতের মুখের জলবিন্দুগুলি মুছতে ব্যস্ত। চুল বেয়ে দুএক ফোঁটা জল এখনও ঝরছে কোলের উপর।

কত হবে ? আঠারো না উনিশ ? নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বেরিয়েছে। কলেজের ছাত্রী। বড়লোকের মেয়ে, পোশাক পরিচ্ছদ হাবভাবেই তার বিজ্ঞপ্তি। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। বেচারি বোধ হয় অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছে বাসে ওঠার। ট্রাম বন্ধ, বাসে প্রচণ্ড ভিড়, হয়তো বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজেছে এখানে। তাই হবে। ব্লাউসটা একেবারে ভিজে গেছে। আনন্দের মতো ও বেচারি তো আর সেটা খুলে মেলে দিতে পারবে না। গায়েই শুকোতে হবে জামাটা। দেশলাইয়ের চতুর্থ কাঠিখানিকে হাতের তালুতে তোয়াজ করতে করতে আনন্দ ভাবছিল, এ মেয়েটিকে নেমে যেতে বলা নিতান্ত অভদ্রতা হবে। সে যাবে আলিপুর ও নিউ আলিপুর! ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আনন্দ নেমে গেলে মেয়েটি অনায়াসে বাকি পথটুকু চলে যেতে পারবে এই ট্যাক্সি নিয়ে। অনেকক্ষণ তোয়াজের পর চতুর্থ কাঠিটা জ্বালবার চেষ্টা করে আনন্দ। জ্বলছে।

সন্তর্পণে সিগ্রেটটা ধরাতে যাবে, পিছন থেকে আবার ধমক শোনা গেল, আচ্ছা অভদ্র তো তুমি! দেখছ পিছনে মহিলা শোয়ারি বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে আর তুমি ফস ফস করে সিগ্রেট খাচ্ছ?

যাঃ! কাঠিটা নিবে গেল আবার!

—চল, চল, আর দেরি কর না।

বিনা বাক্যব্যয়ে আনন্দ তখন পঞ্চম কাঠিটার তারিবৎ করছে।

—আচ্ছা অসভ্য তো তুমি! ট্যাক্সি ছাড়বে কিনা বল?

হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে যায় আনন্দর। ঘাড় ঘুরিয়ে রুক্ষস্বরে বলে নেমে যান। এ ট্যাক্সি যাবে না।

—যাবে না! ইয়ার্কি নাকি! যেতে তুমি বাধ্য। চল বলছি।

আনন্দ মনে মনে এতক্ষণ একটু কৌতুক বোধ করছিল। মেয়েটি তাকে ট্যাক্সি চালক ভেবেছে। মেয়েটির দোষ নেই, সে যেমন গেঞ্জি গায়ে স্টিয়ারিঙের সামনে জুত করে বসে আছে তাতে তাকে তাই ভাবতে হয়। কিন্তু তাই বলে একি ব্যবহার! ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে যে মেয়ে এমন ভাষায় কথা বলে তার বৃষ্টিতে ভেজাই উচিত। আনন্দ স্থির করে, না, কিছুতেই সে এ ধরনের নাক-উঁচু মেয়েকে লিফট দেবে না। দেখতে সুন্দরী বলে ও বোধ হয় ধরাকে সরা জ্ঞান করে। না, কোনও করুণা করবে না আনন্দ, বলে—নেমে যান গাড়ি থেকে। এ ট্যাক্সি যাবে না। ভাড়া হয়ে গেছে।

—ভাড়া হয়ে গেছে! ইয়ার্কি নাকি? মিটার নামানো নেই, প্যাসেঞ্জার নেই—বললেই হল ভাড়া হয়ে গেছে? মগের মুল্লুক পেয়েছে?

আনন্দ ছোট্ট কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে মেয়েটিকে। কাঁপছে সে। রাগে না শীতে?

—তুমি যাবে কি না?

—না। আপনি দয়া করে নেমে যান।

—নেমে যান! কতদিনের লাইসেন্স তোমার? তোমাকে পুলিশে দিতে পারি, তা জান?

আনন্দ এবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে মুখোমুখি তাকায়। বলে—আপনি যাবেন? দয়া করে ডেকে আনুন না। ঐ মোড়ের মাথায় পুলিশ আছে। ডাকলেই আসবে। পুলিশ ছাড়া আপনাকে নামানো যাবে না তা বুঝেছি। কিন্তু যা বৃষ্টি, পুলিশ ডাকি কি করে?

রাগে হোক, শীতে হোক সত্যি থরথর করে কাঁপছে মেয়েটি। ছাতাটা নিয়ে নেমেই পড়ে সে জলের মধ্যে। বলে—তোমার মতো লোকের শাস্তিই হওয়া উচিত। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।

ছাতাটা খুলে এগিয়ে চলে সে মোড়ের দিকে। এমনিতেই সদ্য খোলা

সোডার বোতলের মতো পেটের মধ্যে হাসির বুড়বুড়ি কাটছে, তার উপর ঠিক এই সময় ঘটল আর একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা। বিধাতার রসিকতাবোধ আছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় রঙিন বেঁটে ছাতাটা গেল উল্টে। ছাতা উল্টে গেলেই মানুষ বিব্রত হয়ে পড়ে। সে দৃশ্য দর্শককে হাসির খোরাক যোগায়। তার উপর ছত্রধারী যদি হোন ক্রোধোন্মত্তা একজন সিল্কবসনা আধুনিকা তখন সে গগনভেদী হয়ে ওঠায় কী অপরাধ? হলও তাই। হো হো করে হেসে উঠল আনন্দ। মেয়েটি ঘুরে দেখল একবার। দু চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরছে। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, মেয়েদের মোড়ের পুলিশ, ভাবলে আনন্দ। মোড়ের পুলিসটিরই শরণাপন্ন হল মেয়েটি। পুলিস নয়, সার্জেন্ট।

এইবার ধরানো গেছে সিগ্রেটটা। আঃ, কী আরাম। মেজাজটাও খুশী হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। আহা, বেচারিকে কষ্টটা না দিলেই হত। ভাঙা-কাচ জানলা দিয়ে দেখা যায় বীরাঙ্গনার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে ছপছপ করতে করতে এগিয়ে আসছেন আরক্ষাপুঙ্গব। আরাম করে প্রায় শুয়েই পড়ে আনন্দ। নাটকটা জমছে ভাল। ভালই লাগছে ওর। সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছোকরা এ অসময়ে এসে পড়ে যেন রসভঙ্গ না করে।

—আপকো লাইসেন্স?

যাক সার্জেন্ট-সাহেবের তবু ভদ্রতাবোধ আছে। আধুনিকার কাছে লাই পেয়েও সেন্স হারায়নি। 'তোম' নয়, 'আপ'।

—কিসের লাইসেন্স?

—কিসের আবার? ড্রাইভিং লাইসেন্স।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আনন্দ হেসে বলে - নেই।

—নেই! নেই মানে?

—নেই মানে জানেন না? হিন্দিতে 'নেহী হ্যায়', সংস্কৃতে 'নাস্তি', ইংরেজিতে 'হ্যাভন গট!'

—হোয়াট ডু য়ু মীন?

—আরে এ তো মহা ঝামেলা দেখি। চার চারটে ভাষায় বললাম, তবু বুঝলেন না?

—লাইসেন্স নেই তাহলে ট্যাক্সি চালাও কি করে? ইয়ার্কি নাকি?

আনন্দ ড্যাসবোর্ডের ওপর ধোয়ার রিং ছাড়ছিল। এ কথায় চকিত হয়ে একবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায়। চাকাটাকে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—ভয় পাইয়ে দিলেন স্যার! নাঃ, চাকা ঘুরছে না। ট্যাক্সি চালাচ্ছি কে বললে? স্ট্যান্ডে-রোখা ট্যাক্সিতে বসে সিগারেট খাচ্ছি মাত্র।

সার্জেন্ট পকেট থেকে বার করলে নোটবই আর পেন্সিল। গাড়ির নম্বরটা লিখে নিতে নিতে বলল—তুমি এঁকে তোমার ট্যাক্সিতে নিয়ে যেতে আপত্তি

করেছ ?

—কাকে ? -আনন্দ ঘুরে বসে।

—এঁকে ?

—আনন্দ ভাল করে আপাদমস্তক জলে ভেজা মেয়েটিকে দেখে নিল। রাগে অপমানে মেয়েটি যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় সে।

আনন্দ এতক্ষণে বলে—হ্যাঁ।

—কেন ?

— আমার খুশি।

—খুশি ! তুমি সজ্ঞানে বে-আইনি কাজ করছ তা জান ?

—না, জানি না। আমার আইনজ্ঞান যদিচ অল্প।

—তোমার রসিকতা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তা জান ?

আনন্দ একগাল হেসে বলে—তাও জানি না সার্জেন্ট সাহেব। লাইসেন্স না থাকলেও সেন্স অফ হিউমারটা আমার খুব প্রখর।

মেয়েটি আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। দাঁতে দাঁত দিয়ে গর্জে ওঠে — এ রকম লোকের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত।

হো হো করে হেসে ওঠে আনন্দ।

—হাসছ কেন অসভ্যের মত। ধমকে ওঠে সার্জেন্ট।

—এঁর সেন্স অফ হিউমারটা আমার চেয়েও বেশি বলে। যার লাইসেন্স নেই, উনি তার লাইসেন্স বাতিল করে দিতে চান। এর চেয়ে ক্লাসিকাল হিউমার স্বয়ং জি. বি. এস এর মাথাতেও আসত না।

সার্জেন্ট সে-কথায় কান না দিয়ে বলে—তুমি বলেছ এঁকে যে তোমার এ ট্যাক্সি আগেই ভাড়া হয়ে গেছে ?

গম্ভীর হয়ে আনন্দ বলে—এক্স্যাক্টলি ! তাই বলেছি আমি।

—কই ? কে ভাড়া করেছে ?

—আমি।

—মানে ?

— হায় খোদা ! আমি মানে 'আমি। হিন্দিতে ম্যায়, সংস্কৃতে অহম্, ইংরাজিতে আই।

—হোয়াট ডু য়ু মীন ?

—এবার আমি নাচার সার্জেন্ট সাহেব।

ঠিক এই সময়েই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল ছোকরা ড্রাইভার। হাতের খালি ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাছে এসে বলে—এ আবার কি বখেড়া স্যার ? পুলিশ কেন ?

—তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ওঁকে দেখাও—আর এঁকে বল যে, আমি

পূর্বেই তোমার ট্যাক্সি ভাড়া করেছি।

—এ ট্যাক্সি তোমার ?—সার্জেন্টের প্রশ্ন নবাগতকে।

—হ্যাঁ স্যার। ভয়ে ভয়ে লাইসেন্সটা বার করে বেচারি।

—আর ইনি তোমার ট্যাক্সি ভাড়া করেছেন ?—খাদে নামছে স্বরটা ক্রমশ।

—হ্যাঁ স্যার।

—ইয়ে, তবে সামনের সীটে ওখানে ওঁকে বসিয়েছ কেন ?—কণ্ঠস্বর এবার নিখাদে।

হো হো করে আবার হেসে ওঠে আনন্দ। বলে, এতক্ষণে একটি আইনসঙ্গত কথা আপনি বলেছেন সার্জেন্ট সাহেব। প্যাসেঞ্জারকে সামনের সিটে বসানোর অপরাধে ওর সাত মাসের ফাঁসি হওয়া উচিত ; এবং বসার অপরাধে আমার না-থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল।

অপ্রস্তুত সার্জেন্টটি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ছোকরাকেই বলতে থাকে—উনি ভাড়াই যদি করে থাকেন তাহলে মিটার নামাওনি কেন ?

—আমি একটু চা খেতে চাইলুম। উনি বললেন, যাও, খেয়ে এস। তা আমি ভাবলুম আমি খাব আর ওঁর মিটার উঠবে এ কেমন কথা ?

সত্যই ভদ্রতাবোধ আছে সার্জেন্ট সাহেবের। আনন্দের দিকে ফিরে বলেন—আয়াম সরি।

আনন্দ বললে—য়ু অট টু বি। আপনি নিজে সার্ট চড়ালে বনেন সার্জেন্ট, খুললে বনেন ভদ্রলোক। আর আমার বেলায় পাঞ্জাবি চড়ালে ভদ্রলোক, আর খুললে আপসে তোম !

পিছনের পাল্লাটা খুলে দিয়ে মেয়েটিকে ডাকে, আসুন—মেয়েদের সামনে সিগ্রেট খেলেও একেবারে অসভ্য বর্বর আমি নই। অন্তত এই দুর্যোগে গঙ্গাসাগরে নবকুমারীকে বিসর্জন দিয়ে পালাব না। উঠুন, আমিও আলিপুরের দিকেই যাব।

মেয়েটি তখনও কাঁপছে। শীতে, রাগে না লজ্জায় ?

হয়তো তবু সে কিছু বলত, হয়তো প্রত্যাখ্যান করত এ আহ্বান, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার ঝেঁপে জল এল। সার্জেন্ট ছুটল ও ফুটপাতে।

আনন্দ বললে—হে মাধবী দ্বিধা কেন ?

ভারি ফক্কর তো ছেলেটা ! শর্মিলা মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। হ্যাঁ, ভুল সে করেছে, মর্মান্তিক ভুল ; কিন্তু তাই বলে নবকুমারী, মাধবী—এসব কী ? কিন্তু ইতস্তত করবার সময় নেই। মরিয়া হয়ে সে উঠে বসে ট্যাক্সিতে।

ছাড়ল ট্যাক্সি।

কলেজ স্ট্রীট—ওয়েলিংটন—ধর্মতলা—

মুখ না ঘুরিয়েই আনন্দ বলে—সিগ্রেট-গন্ধ সহ্য হয় না বুঝি ? আচ্ছা

এটা ফেলেই দিই।

জানলা দিয়ে ফেলে দেয় অর্ধদগ্ধ সিগ্রেটটা। শর্মিলা চুপচাপ বসে আছে। চৌরঙ্গী—ভবানীপুর—

আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আনন্দ বলে—আমি নামব ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আপনি?

শর্মিলা তবু জবাব দেয় না। আনন্দ এবার পিছন ফিরে বলে নিউ আলিপুর যাবেন তো?

মেয়েটি বললে—না। আমিও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে নামব।

—ও! তবে তো কথাই নেই।

আর কোন কথা হয়নি গাড়িতে। ঐ ছোকরা ড্রাইভারের সামনে আর কিছু বলতে চায়নি শর্মিলা। কিন্তু তার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের কাছে জনান্তিকে ক্ষমা চেয়ে না নিলে যেন তার স্বস্তি নেই। ছি ছি ছি! ভদ্রলোককে যা নয় তাই বলেছে। কী মর্মান্তিক ভুল!

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গাড়ি দাঁড়াবার আগেই ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে টাকাটা বার করে রেখেছিলো শর্মিলা। বৃষ্টিটা একেবারে না ধরলেও কমে গেছে। দ্রিমি দ্রিমি বোল আর নেই। ইলসেগুঁড়ির ছিটে। আনন্দ প্রতিবাদ করবার উপক্রম করতেই শর্মিলা বলে-- তা হয় না।

আনন্দ দ্বিরুক্তি করেনি ও বিষয়ে, বলে আপনার না নিউ আলিপুরে যাবার কথা? এখানে নেমে পড়লেন যে?

ট্যাক্সিটা ব্যাক করছে। আর লজ্জা করে লাভ নেই। শর্মিলা বলে, আপনার সঙ্গে যে অভদ্র ব্যবহার করেছি সে জন্য ক্ষমা চেয়ে না নিলে আমি শান্তি পাব না।

—অভদ্র ব্যবহার!—আনন্দের চোখে বিস্ময়। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওর। হো হো করে হেসে ওঠে আবার। কৌতুককর ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছিল বুঝি। বলে, এর জন্য আমার চেহারাটাই দায়ী।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠতে থাকে। শর্মিলাও আস্তে আস্তে উঠে আসে তার সঙ্গে। আনন্দ বলে—এর আগে এসেছেন কখনও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে?

—না তো।

—আশ্চর্য! আপনি ছাত্রী তো? প্রেসিডেন্সির? কোন ইয়ার? সায়ান্স না আর্টস?

হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সিই। সেকেন্ড ইয়ার, আর্টস।

—অথচ কখনও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আসেননি? চিড়িয়াখানা দেখেছেন? শহরের সব কটা সিনেমা 'হল'?

শর্মিলা অবাক হয়ে যায়। এ যে রীতিমত ধমক দিচ্ছে! লোকটার মাথায় ছিট আছে নাকি? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শর্মিলা।

আনন্দ হঠাৎ ঘুরে বলে—আবার দাঁড়ালেন কেন? এলেন যখন তখন জন্মের শোধ একবার দেখেই যান, জাত যাবে না।

শর্মিলা আবার চলতে শুরু করে। লাইব্রেরী দেখার শখ যতটা, এই অদ্ভুত মানুষটাকে আরও ভাল করে দেখার ইচ্ছেটা তার চেয়ে কম নয়। মুখে বলে—চলুন, দেখেই যাই। মন্দিরের দোরগোড়া থেকে ফিরে যাওয়া ঠিক নয়।

একগাল হেসে আনন্দ বলে—তা সত্যি! মন্দিরই! কত সহস্রাব্দির সাধনা এখানে আশ্রয় পেয়েছে। দেশে বিদেশে যুগে যুগে মানুষ যা ভেবেছে, যা উপলব্ধি করেছে তা এখানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা আছে। ভেবে দেখুন, যেসব যুগে আমরা বাস করিনি, যেসব মানুষকে দেখিনি, জানি, না তাঁদের কণ্ঠস্বর এখানে অমরত্ব লাভ করেছে। অসংখ্য জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতের জয়ের কথা পরাজয়ের কথা, লাভক্ষতির কথা তাঁরা অক্ষরের শৃঙ্খলে বেঁধে এখানে গচ্ছিত রেখে গেছেন। যাকে দেখা যায় না, যাকে ধরা যায় না, তাকেই দেখবার, দেখাবার আর ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। একে আপনি মন্দির বলতে পারেন।

শর্মিলা আনন্দের পায়ে পায়ে সে গ্রন্থ-মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রকাণ্ড হল ঘর। মাঝখানে কার্পেট পাতা। দু-পাশে বেতের আরাম কেদারা। আর তারপরে ছাদ-ছোঁওয়া বইয়ের র‍্যাক। দূরে একটি বুদ্ধমূর্তি। ধূপ ধুনো নেই, তবু কিসের যেন একটা মৃদু গন্ধ। এ গন্ধ পুরনো বইয়ের। প্রাণ ভরে সেই সৌরভ গ্রহণ করল শর্মিলা। চিন্তা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সহস্র বৎসরের জ্ঞানী গুনীদের সাধনাকে ধরবার ক্ষমতা ওর নেই—তাই বোধ দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে তাকে স্পর্শ করবার জন্য একটা আকুলতা জাগে মনে।

আনন্দ ওর কানে কানে বললে—The gloomy recess of an ecclesiastical library is like a harbour, into which a far-reaching curiosity has sailed with its freight and cast anchor.

শর্মিলা বলে—পুরানো বইয়ের কী চমৎকার একটা গন্ধ আছে, না?

আনন্দ সেকথায় কান না দিয়ে বলেই চলে—The ponderous tomes and bales of the mind's merchandise, odours of distant countries and times steal from the red leaves the swelling ridges of vellum, and the tittles in tarnished gold……

শর্মিলা হেসে হেসে বলে—আপনি কলেজে ইংরাজি পড়ান বুঝি?

আনন্দ এতক্ষণ আত্মমগ্ন ছিল। হঠাৎ ওর কথায় খেয়াল হয় সে একা নয়, একটু হেসে বলে—না। আমি পড়াই না, পড়ি। তাও ইংরাজী নয়, ইতিহাস।

—তাহলে লাইব্রেরী দেখে হঠাৎ ইংরাজি উদ্ধৃতি মনে পড়ল কেন আপনার ? আমার তো মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কথা—

—তাই নাকি ? কী ?

শর্মিলা নিম্নস্বরে আবৃত্তি করে, 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাসঙ্গীতের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে !'

আনন্দ অবাক বিস্ময়ে কয়েকটা মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল শর্মিলার দিকে তাকিয়ে। সে নীরব দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে লজ্জা পেয়েছিল শর্মিলা। আজ এতদিন পরেও সেই প্রথম পাওয়া লজ্জার অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে ওর। তখন মনে হয়েছিল, এতটা প্রগলভ হওয়া ঠিক হয়নি। 'সাধারণ পাঠাগার' ওদের পরীক্ষার লাস্ট-মোমেন্ট সাজেশন ছিল। তাই রাত জেগে এই উদ্ধৃতিটা মুখস্থ করেছিলো শর্মিলা। সুযোগমত আউরে দেবার লোভ সামলাতে পারেনি। ওর মনে হল, কী দরকার ছিল পাণ্ডিত্য জাহির করতে যাবার ? সহজ হবার জন্য গলার স্বরটা পালটে নিয়ে বলে—নিন চলুন, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন ?

আনন্দ জবাবে বলেছিল—না দেখুন, আমি ভাবছিলুম কথাগুলো তো আগেও শুনেছি, কিন্তু আজ আপনার মুখে শুনে মনে হল যেন ওর একটা নতুন অর্থ ধরা পড়ল আমার কাছে।

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য লজ্জিত শর্মিলা তাড়াতাড়ি বলে—আমাকে এই লাইব্রেরীর মেম্বার করে দিন না।

আনন্দ সেকথা কানে তোলেনি। আপন মনে বলতে থাকে—'মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ঠিক যেন রূপকথার রাজকন্যা। সে প্রতীক্ষা করে আছে কবে আসবে দরদী পাঠক রাজপুত্রের বেশে, তাকে ওই কারাগার থেকে মুক্ত করে সার্থকতা দান করতে। আপনার মুখে এভাবে, এ পরিবেশে না শুনলে কথাটার ঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারতুম না। এ উদ্ধৃতি তো আমার অজানা নয়, তবু আপনার মুখে শুনে আমার কেমন রোমাঞ্চ হয়েছে দেখুন।

লোকটা পাগলই ! হঠাৎ রোমশ বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দেয় শর্মিলার দিকে। আর অম্লান বদনে ডান হাতে ওর একখানা হাত তুলে নিয়ে সেই রোমশ হাতের উপর বুলিয়ে দেয়। শর্মিলা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল লোকটার ব্যবহারে। এভাবে অপরিচিতা কোন ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দেয় নাকি কোন সুস্থমস্তিষ্ক

মানুষ? চকিতে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নেয়। না, কেউ ওদের লক্ষ্য করছে না। বর্ষার দিনে এমনিতেই লোকজন কম। যাঁরা আছেন তাঁরাও যে যার পুস্তকে নিবদ্ধদৃষ্টি। আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল শর্মিলা। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিল আনন্দের দিকে। না, বিসদৃশ কিছু হঠাৎ করে বসলে অপ্রস্তুত ভঙ্গি হয়, তার লেশমাত্র আভাস নেই ওর দৃষ্টিতে। যেন শর্মিলা স্ত্রীলোকই নয়। আনন্দ বলে—দেখেছেন সত্যি রোমাঞ্চ হয়েছে কিনা?

শর্মিলা জবাব দেয়নি। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় তারও যে রোমাঞ্চ হয়েছিল অমন হঠাৎ হাতখানা টেনে নেওয়ায়। অপরের হাতে রোমাঞ্চ হয়েছে কিনা বুঝবে কেমন করে! কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। শর্মিলা সহজ হবার জন্য যা হোক কিছু বলতে চায়, বলে—তাই কখনও হয়?

—কেন হবে না? 'বেলা যায়' কথাটা লালাবাবু জীবনে তো লক্ষবার শুনেছিলেন, কিন্তু কই, কোনবার তো তাঁর বৈরাগ্য জাগেনি। সেই বিশেষ সন্ধ্যায়, বিশেষ পরিবেশে ঐ 'বেলা যায়' কথাটাই তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছিল। আমারও আজ ঠিক তাই হয়েছে। মানবাত্মার অমর আলোকের সন্ধানেই যে তীর্থযাত্রীর মতো এখানে আসি সেই সত্যটা আজ যেন নূতন করে অনুভব করলুম ঐ 'মন্দির' শব্দটার ব্যবহারে। হয়তো তার জন্যে কিছুটা দায়ী আজকের এই মেঘলা সন্ধ্যার বিচিত্র পরিবেশ, কিছুটা আমার মানসিক প্রস্তুতি, কিছুটা আপনার কণ্ঠস্বর, কিছুটা বা আপনার আর্দ্র সৌন্দর্য!

নিঃসন্দেহে লোকটা পাগল। অথবা বদমায়েস। হয় 'ফুল' নয় 'নেভ'! যদি পাগল হয় তো বদ্ধ উন্মাদ, যদি বদমায়েস হয় তো সুচতুর সন্ধানী! একেবারে বোঝা যায় না। তা সে যাই হোক, শর্মিলা মনস্থির করে ফেলেছে। নবকুমারী, মাধবী শুনে ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল, এই আর্দ্র সৌন্দর্যের উল্লেখে সে বুঝতে পারে লোকটা বোধ হয় পাগল নয়, বদমায়েস। ভালমানুষের ভেক ধরেছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাই বলে—যাক, এবার আমি চলি।

—সে কি! এখনও তো কিছুই দেখেননি।

—না, ভিজে কাপড়ে ঠাণ্ডা লাগবে। আমি বরং যাই। নমস্কার।

আনন্দ প্রতিনমস্কার করেনি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় যেন চমকে উঠে বলে—ওঃ! বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ইস্যু-কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে এক্ষুনি।

হন্তদন্ত হয়ে সে চলে যায় ভিতরের দিকে।

মনে আছে, অনেকক্ষণ চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়েছিল শর্মিলা। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। একটি দুটি করে পড়ুয়ার দল আসছে, যাচ্ছে। চোখ তুলেও কেউ দেখছে না শর্মিলাকে। সবাই আপন মনে ব্যস্ত। শর্মিলা

ভাবছিল লোকটা কে? কী নাম? কোথায় থাকে? এর আগেও কি সে অমনি অপরিচিতা কোন মেয়ের হাত খপ্ করে চেপে ধরেছে কখনও? ওকি সত্যই অন্যমনস্ক আপন-ভোলা পণ্ডিত মানুষ? না কি আড়াগোড়াই অভিনয় করে গেল? লোকটার কৌতুকবোধ কিন্তু প্রখর। সার্জেন্টটাকে কেমন নাজেহাল করেছিল! আর শুধু কি সার্জেন্টটাকে? তাকে নয়? মুহূর্তের পরিচয়ে তাকে কত কি বানিয়েছে। বার্নার্ড শ-র চেয়ে নাকি ওর সেন্স-অব-হিউমার বেশী, নবকুমারের কাষ্ঠান্বেষণে যাবার চেয়ে ওর পক্ষে সার্জেন্ট অন্বেষণে যাওয়া নাকি বেশী অ্যাডভেঞ্চারাস! ওর ইতস্তত ভাবে লোকটা বলেছিল—হে মাধবী দ্বিধা কেন? এগুলি কৌতুক, এগুলি শ্লেষ, শর্মিলা তা বোঝে। কিন্তু শর্মিলার আর্দ্র সৌন্দর্যের প্রশংসা করার সময়ও কি ওর কণ্ঠে কৌতুক ছিল? আবার এই তো শর্মিলার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লোকটা দিব্যি ছুটে গেল ইস্যু-কাউন্টারের দিকে! একবার ফিরেও দেখল না শর্মিলা গেল, না দাঁড়িয়ে রইল!

এর পরের কয়েকটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে ওর। কী যেন হয়েছিল শর্মিলার। কোন কিছুতেই মন লাগত না, সব সময়েই মনে পড়ত সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। একটা উট্‌কো অচেনা লোক ওর মনের বাগানে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মতো হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হল! ভেঙে তছনছ করে দিয়ে কোথাকার হাওয়া কোথায় চলে গেল। সময়ে অসময়ে সারাদিনই মনে পড়ত সেই অদ্ভুত লোকটার কথা। দোহারা ফরসা চেহারা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, কিন্তু দাড়ি কামায়নি কেন সে? দাড়ি না-কামানো মানুষ দেখলেই ওর রাগ হয়।

ড্যাডি প্রত্যহ দাড়ি কামায়, দাদাও কামায়। যে পরিবেশে সে মানুষ সেখানে সকালে দাঁতমাজার মত প্রাত্যহিক দাড়ি-কামানোও নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়েছিল, লোকটা নোংরা। বস্তুত পাঞ্জাবিটা খুলে রেখেছিল বলে নয় ঐ একদিনের দাড়ি না-কামানো গালটা দেখেই শর্মিলা ভেবেছিল ও ট্যাক্সি-ড্রাইভার।

সত্যিই ওকে ভুলতে পারেনি। সেই লোকটার চাহনিতে, হাসিতে, সমস্ত ব্যক্তিত্বে এমন একটা কিছু ছিল যা ভোলা যায় না। কিসের অমোঘ আকর্ষণে সে এসে নাম লিখিয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। কলেজ কামাই করে বসে থাকত ওখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ইস্যু-করা বই কোলে নিয়ে। নিজের পাগলামিতে নিজেকেই ধমক দিত। তবু সংযত হতে পারেনি। আর কিছু নয়, কৌতূহল। জেনে নিতে হবে, কে সেই লোকটা। সে কী? উদাসীন, আত্মভোলা, না লুচ্ছা বদমায়েস! শর্মিলা জানে সে সুন্দরী, অনেকের মুগ্ধ দৃষ্টির আরশিতে এ সংবাদ সে পাঠ করেছে। অনেক পার্টিতে, অনেক জনান্তিক

সুযোগে এ তথ্য নিবেদন করেছে তাকে অনেকে। কিন্তু সেসব স্তুতিবাণীর সঙ্গে এ লোকটার মুগ্ধ প্রশংসার তফাত আছে। তবু ওর সন্দেহ হয়, সত্যিই কি লোকটা মুগ্ধ হয়েছিল? তাহলে হঠাৎ অমন অদ্ভুত অনাসক্তিতে সে কেন ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল তার সান্নিধ্য থেকে?

মাঝে মাঝে মনে হত, এ কি ক্ষ্যাপামি! কোথাকার কে একটা অযত্নবিন্যস্ত কেশ নোংরা মানুষ, ভাল করে পরিচয়ই হয়নি তার সঙ্গে। তবু তারই জন্যে শর্মিলা কেন রোজ ছুটে আসে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে? তার সঙ্গে দেখা হলে কী বলবে শর্মিলা? ভদ্রলোক যদি ওকে চিনতে না পারে? যদি বলে, কোথায় দেখেছি বলুন তো আপনাকে? অথবা যদি চিনতে পেরেও বলে, ভাল তো? আর বলেই যদি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় ইস্যু-কাউন্টারের দিকে? তাহলে শর্মিলা কী করবে? শুধু আর একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যেই কি এই ক্লাস-পালানোর কৃচ্ছ্র সাধন? একেই কি বলে পূর্বরাগ? প্রেম? অসম্ভব! প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম হয়, এ কথা শর্মিলা বিশ্বাস করে না। এ শুধু একটা কৌতূহল; হ্যাঁ, তীব্র কৌতূহলই। লোকটার পূর্ণ পরিচয় জেনে নিতে হবে। জানতে হবে কেন সে এমন উদাসীন আনমনা। বুঝে নিতে হবে অদ্ভুত সাক্ষাৎকারের কথা ও লোকটার মনে আছে কিনা।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে ভদ্রলোক মফস্বলে থাকেন। ডাকেই বই নেন, ফেরত দেন। ক্বচিৎ কখনও কলকাতায় এলে নিজেই আসেন গ্রন্থাগারে। নামটা জানা থাকলেও তবু সন্ধানের একটা সূত্র পাওয়া যেত। কিছুই যে জানা নেই অথচ তা সত্ত্বেও কলেজ কামাই করে এভাবে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এসে বসে থাকার কোন মানে হয়?

দিনকতক পরে আবার অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল। দূর থেকে আনন্দকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল শর্মিলা। আনন্দ ওকে দেখতে পায়নি প্রথমটা। খান দুই বই নিয়ে সে এদিকে আসছিল হন্ হন্ করে। নিজের অজ্ঞাতসারে আসন ছেড়ে শর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। ঠিক তখনই আনন্দ ওকে দেখতে পায়। আর ঠিক তখনই একটা বিসদৃশ কাণ্ড করে বসে যার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না শর্মিলা। ওকে দেখতে পেয়েই আনন্দ বলে ওঠে—এই তো আপনি! ও! কোথায় ছিলেন এতদিন?

শর্মিলা স্তম্ভিত যায় হয়ে। আনন্দ মোটেই নিম্নস্বরে বলেনি কথা কটা। আশপাশের কয়েকজন মুখ তুলে তাকায়। শর্মিলা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। লোকটা পাগল নয়, বদ্ধ উন্মাদ। এতগুলো কৌতূহলী চোখ যে ওদের দেখছে তা যেন খেয়ালই নেই। লোকটা বলে—বেশ যা হোক, কদিন ধরে পড়াশোনা আমার মাথায় চড়ে গিয়েছিল।

শর্মিলা বুঝতে পারে এ পাগলকে সামলাতে হলে এখনই বাইরে যেতে

হয়। কি জানি কী কাণ্ড করে বসে ঠিক কি! বলে—আপনাকে সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, বাইরে আসুন।

—কথা তো আছেই, অনেক কথা। চলুন, বাইরে যাই।

দুজনে পাশাপাশি চলতে থাকে নির্গমন দ্বারের দিকে কিন্তু বাধা দিল একজন কর্মচারী। আনন্দের হাতে যে বইখানি আছে সেটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার ছাড়পত্র নেই। সেটা ওখানে বসে পড়ার জন্য ইস্যু করিয়েছে মাত্র।

—ও হো, তাইতো! আচ্ছা এটা রেখে এক্ষুনি আসছি—বলে সে ফিরে যায়। কয়েকটা পা গিয়েই আবার ঘুরে এসে শর্মিলাকে বলে—আপনি আবার হারিয়ে যাবেন না যেন। এখানেই অপেক্ষা করুন। এক মিনিট।

ভীষণ হাসি পায় শর্মিলার। লোকটা একেবারে ছেলেমানুষ। একটু পরেই ফিরে আসে আনন্দ। দুজনে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে আসে। বাগানের একটা বড় রেইন-ট্রি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে। দুদিন বৃষ্টি হয়নি, ঘাস বেশ শুকনো, বসা যায়। আনন্দ পকেট থেকে রুমালটা বার করে পেতে দেয়। বলে—বসুন, অনেক—অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আর এক পকেট থেকে বার করে ছোট্ট একটা নোটবুক। ফাউন্টেন পেনটা বাগিয়ে ধরে বলে—ফার্স্ট অফ অল, আপনার নাম আর ঠিকানাটা বলুন।

শর্মিলা ভাবে লোকটার ব্যবহারে উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে সে নিজে। কিন্তু তার চরম ক্লাইম্যাক্স কোথায়? এইটেই কি সবচেয়ে বেশী স্তম্ভিত হবার মুহূর্ত? গম্ভীর হয়ে বলে—সেই কথা শুনবার জন্যেই কি তখন হলের মধ্যে অমনভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন?

—না, চেঁচাইনি তো।

—আমি যদি তখন বাইরে আসার কথা না বলতাম, তাহলে ওখানেই আপনি নোটবই বার করে এ প্রশ্ন করতেন তো আমাকে?

অদ্ভুতভাবে হাসল লোকটা। বললে—আমি কি পাগল? ওখানে সবাই পড়াশুনা করছেন, আমি তাঁদের ডিসটার্ব করতে যাব কেন? কিন্তু কি জানেন, নাম আর ঠিকানা জানা না থাকলে এই কলকাতা শহরে একটা আস্ত মানুষ একেবারে বেমালুম না-পাত্তা হয়ে যায়। এ কদিন ধরে কেবলই মনে হয়েছে—কী বোকামিই করেছিলুম সেদিন আপনার নাম ঠিকানা জেনে নিইনি বলে। আপনি শুধু বলেছিলেন, আপনি প্রেসিডেন্সির ছাত্রী, সেকেন্ড ইয়ার, আর্টস। এই দেখুন আপনাদের রুটিন। এ তিনদিনই চারটে পঁয়ত্রিশে আপনাদের ক্লাস ভেঙেছে অথচ আপনাকে ধরতে পারিনি। বোকার মত পায়চারি করেছি কলেজ স্ট্রীটে।

শর্মিলা স্থির করল, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হলে বিস্ময়ের অনুভূতিটাকে আরও ভোঁতা করে দিতে হবে। কোন কিছুতেই অবাক না হবার মতো মনের গঠন চাই। সে যখন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে অলসভাবে পাতা উলটে গেছে তখন ও লোকটা প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে ক্রমাগত পায়চারি করে গেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ কদিন সে ক্লাসে যায়নি। গেলে হয়তো পাগলটা ওর সহপাঠীদের সামনেই ট্রাম রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম করে নোটবুক বার করে হাঁকত—আপনার নাম আর ঠিকানাটা? তাহলে কলেজ থেকে নাম কাটাতে হত তাকে।

কিন্তু এতে এত হাসির বা কি আছে? লোকটা সরল ভাবে স্বীকার করেছে বলেই হাস্যাস্পদ? আর সে কি কিছু কম করেছে? কলেজ কামাই করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে থাকে নি? সেটাও কি কলেজ স্ট্রীটে পায়চারি করার চেয়ে কম হাসির খোরাক?

—ওঃ! খুব ভুগিয়েছেন আপনি!

—কিন্তু এভাবে ভুগবার দরকার কি ছিল?

—আরে বাঃ! কী যে বলেন! এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছবার জন্যে রুমালের সন্ধানে বারকয়েক এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ালো। সেটা যে এইমাত্র ঘাসের উপর পেতে দিয়েছে তা বোধ হয় মনে নেই। শেষ পর্যন্ত অন্যমনস্কভাবে শর্মিলার লুটিয়ে পড়া আঁচলটা তুলে নিয়ে কাচটা মুছতে মুছতে বলে—আপনার কম্বিনেশান কি?

আঁচলটা ওর হাত থেকে সন্তর্পণে ছাড়িয়ে কাঁধের উপর ফেলে শর্মিলা বলে-সংস্কৃত, সিভিক্স্ আর লজিক।

- আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিসের?

—আপনি হিস্ট্রি নেননি?

—না। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

—না, হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, আমি ভেবেছি আপনি ইতিহাস নিয়েছেন, এবং আই. এ পাশ করে ইতিহাসেই অনার্স নেবেন।

—এ রকম অদ্ভুত ধারণা হল কেন আপনার? আপনি যেহেতু ইতিহাস পড়েন, তাই দুনিয়ার তাবৎ সুন্দরী মেয়ে ইতিহাসে অনার্স নেবে, এ কেমন কথা?

অন্য কেউ হলে এই 'সুন্দরী' বিশেষণটা নিশ্চয় ব্যবহার করত না সে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে ওকে খানিকটা চিনতে পেরেছে—তাই একটু বাজিয়ে

নেবার জন্য ঐভাবেই কথাটা বলেছিল শর্মিলা। লোকটা কিন্তু সে ইঙ্গিতের ধার কাছ দিয়েও গেল না। বললে—না না, তা কেন? দুনিয়ায় সবাই নেবে কেন? আমি ভেবেছিলুম আপনি শুধু নেবেন।

—আমার প্রতি হঠাৎ এ অনুগ্রহ কেন?

—না না, অনুগ্রহ নয়, কিন্তু সেদিন আপনি এমন দরদ দিয়ে ঐ কথাকটি বলেছিলেন যে, আমার মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই আপনি ইতিহাস ভালবাসেন।

শর্মিলা বলে—সেটাও আপনার অন্যায়। এ লাইব্রেরীতে শুধু ইতিহাসের বই-ই থাকে না। মানবাত্মার অমর আলোক কি শুধু ইতিহাসের পাতাতেই সীমিত? দর্শনে নেই, সায়ান্সে নেই, কম্পারেটিভ রিলিজিয়নে নেই?

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল লোকটা। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—ঠিক কথা। না, আমারই ভুল। হ্যাঁ, তা তো বটেই। আচ্ছা চলি।

নোট বইখানা পকেটে পুরে ফেলে। যেন এটুকু জানবার জন্যেই আজ কদিন ধরে সে ক্রমাগত পায়চারি করেছে কলেজ স্ট্রীটে।

শর্মিলার কি-জানি কী হল, একেবারে মিছে কথা বলে বসল একটা—আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন। সত্যিই ইতিহাসকে ভালবাসি আমি। তবে কি জানেন, হিস্ট্রিতে নম্বর তোলা ভীষণ শক্ত। তাই ওটা নিইনি।

আবার বসে পড়ে আনন্দ, বলে—এ একেবারে ভুল ধারণা। আর তাছাড়া নম্বর-ফম্বর সব বাজে কথা। ওই তোমাদের এক বাতিক। পরীক্ষার নম্বর দিয়ে কি ধুয়ে খাবে? অত নম্বর-নম্বর কর কেন?

শর্মিলা জবাব দেয় না। সিনেমায়-গল্পে-উপন্যাসে সে দেখেছে দুটি অপরিচিত মেয়ে-পুরুষের প্রথম পরিচয়ে দু-পক্ষই আপনির ব্যবধানে আলাপ-চারী শুরু করে। তারপর কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে সেই আপনি হয় তুমি। শিল্প-সাহিত্যের কল্যাণে সেই তুমি-ডাকার মুহূর্তটির মূল্য সম্বন্ধে শর্মিলা সচেতন ছিল। অথচ ওদের ক্ষেত্রে সেই পর্যায়টা এল না, আসবে না। প্রথম দর্শনেই শর্মিলা ওকে তুমি সম্বোধন করেছিল, আবার উঠেছে 'আপনি'তে; কে জানে আবার কোনদিন 'তুমি'তে, নামতে পারবে কিনা! আর ঐ লোকটা আজ অনায়াসে নেমে এল 'তুমি'তে! কিন্তু কই, রোমাঞ্চ হল না তো শর্মিলার সর্বাঙ্গে!

আনন্দ তখনও বলছে—কিন্তু তোমাদের সে ধারণা ভুল। ইতিহাস মানেই কতকগুলো সাল-তারিখ আর নামের তালিকা নয়। তার গোপনকথা আবিষ্কার করার আনন্দ গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার চেয়ে কিছু কম নয়। ইতিহাসের আলো-আঁধারি অলি-গলিতে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ সত্যের মুখোমুখি হলে সত্যিই রোমাঞ্চ হয় ইতিহাসবেত্তার।

রোমাঞ্চের কথাতে শর্মিলার মনে পড়ে গেল আগের দিনের কথা। এখনই রোমাঞ্চ হবে নাকি ওর? আর তাই পরখ করবার জন্য শর্মিলার হাতখানা টেনে নেবে সে? না, সে-রকম কিছু ঘটল না। ব্যাগ থেকে একতাড়া কাগজ বার করে শর্মিলাকে দিল আনন্দ। বললে—বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখুন। লেখাটা এখনও প্রকাশ করিনি কোথাও। শেষও হয়নি লেখাটা। জাস্ট এ স্কেচি ড্রাফ্‌ট!

আবার তুমি থেকে আপনি। শর্মিলা সে কথা গ্রাহ্য না করে বলে কী ওটা?

—মৌর্যযুগের স্ত্রী-স্বাধীনতা। বিষয়টা পুরানো, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটা নূতন। পড়েই দেখুন আপনি।

পরমুহূর্তেই ওর হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটা ফের কেড়ে নিয়ে বলে—আচ্ছা, আমিই বরং পড়ে শোনাই। কতক্ষণই বা লাগবে।

শর্মিলা কিন্তু রাজী হতে পারে না। সে তো আর পাগল নয় ঐ লোকটার মত? ন্যাশনাল লাইব্রেরীর রেইন-ট্রি গাছের নিচে বসে শুনবে মৌর্যযুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। বলে—আমি বরং ওটা নিয়ে যাই। এখানে অন্ধকারে পড়া যাবে না। পড়ে পরে আপনাকে ফেরত দেব।

—তার চেয়ে আমার মেসে চলুন না। সেখানে বাতি আছে।

—কোথায় মেস আপনার?

—বাদুরবাগান।

—সেখানে সবাই ছাত্র বুঝি?

—না সবাই নয়, যদুবাবু কেরানী, মহেন্দ্রবাবু ইনসিওরেন্সের দালাল।

—তা সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে মৌর্যযুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার আলোচনা করলে তাঁরা কিছু মনে করবেন না?

আনন্দ বিহ্বল হয়ে বলেছিল—কেন? কী মনে করবেন?

—কিচ্ছু না! কিন্তু একটা কথা। মৌর্যযুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্বন্ধে আমার যেমন কোন ধারণা নেই, এ বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী ঘরের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনারও তেমনি কোন ধারণা নেই, মিস্টার···

নিরাশ হতে হল শর্মিলাকে। ভদ্রলোক তার অসমাপ্ত বাক্যের পাদপূরণ করে দিলেন না। চোখ থেকে চশমা খুলে পাঞ্জাবির প্রান্তে তার কাচটা মুছতে মুছতে বলেন—বেশ। আপনিই ওটা নিয়ে যান। পড়ুন। তারপর একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশান করা যাবে, বুঝেছেন! আলোচনার পরে ওটা আবার রিরাইট করব বরং।

শর্মিলা কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিল- কোথাও লেখকের নাম

ঠিকানা লেখা নেই। বললে—লেখাটা পড়ে ফেরত দেব কাকে?

—কেন, আমাকে।

—তাহলে আপনার নাম আর ঠিকানাটা জেনে রাখতে হয়। নাম-ঠিকানা জানা না থাকলে এই কলকাতা শহরে একটা আস্ত মানুষ বে-পাত্তা হয়ে যায় কিনা!

একগাল হেসে লোকটা বলেছিল—তা ঠিক। এই যেমন আপনি হারিয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা দিন—

পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিয়ে তার ওপরে লিখে দিল ঃ আনন্দ মিত্র।

বাদুড়বাগান মেসের ঠিকানাটাও লিখে দিল। এরপর আরও অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করেছিল সেই গাছতলায়। আলিপুর রোড দিয়ে দ্রুতগামী মটোরের ধাবমান ছন্দ। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ঘনসবুজ ঘাসের ওপর যেন একটা যাদুস্পর্শ। কয়েকটা শালিক এসে বসেছে অদূরে কী নিয়ে যেন তাদের প্রচণ্ড বচসা বেধেছে। একটা ঝাড়ুদার চলে গেল কাগজের টুকরো আর বাদামের খোলা কুড়িয়ে নিয়ে। লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে একজন বৃদ্ধ চলে গেলেন। লাইব্রেরী থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে পড়ুয়ার দল। আবার ঘণ্টা বাজল গ্রন্থাগারে।

উঠে পড়ল ওরা। সেই আশ্চর্য সন্ধ্যার কথা ভুলবার নয়। শর্মিলার মনের মণিকোঠায় সেই অদ্ভুত সন্ধ্যাটির স্মৃতি সোনার জলে লেখা আছে। অথচ তার উপকরণ অতি সামান্য, উপচার নগণ্য। ভেবে দেখতে গেলে কিছুই নেই। তবু প্রথম পরিচয়ের সেই অবাক মুহূর্তগুলি অদ্ভুত মোহময়। দুটি বিভিন্ন সত্তা দুটি ভিন্ন ধারায় এসে মিশেছে এক সঙ্গমে। উদাসীন আনমনা আনন্দের অনেক কথাই জেনে নিয়েছিল শর্মিলা। আনন্দ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। থাকবার মধ্যে আছে এক ছোট বোন। উমা। দেশের বাড়িতে থাকে। দেশ কোথায়? বহরমপুর। সঙ্গে সঙ্গে লালবাগ আর পলাশীর প্রসঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিল আনন্দ। কিন্তু শর্মিলা তাকে রাশ টেনে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার নিজের কথায়। বহরমপুরে ওদের পৈতৃক ভিটের দুটি ঘর পেয়েছে আনন্দ। উমা সেখানেই থাকে। রতনদাদু তার দেখাশোনা করেন। রতনদাদু কে? আনন্দের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভাই। আনন্দ একটা চাকরি পেলে উমাকে নিয়ে আসবে ওখান থেকে। তারপর দেখেশুনে বোনের একটা বিয়ে দিতে হবে। লেখাপড়া? না, উমার আর লেখাপড়া হল কোথায়? কোথায় পাবে অত পয়সা? আনন্দেরও হত না, নেহাৎ বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছে বলেই বন্ধ হয়নি পড়াশুনাটা। তা সে যাই হোক, বোনের বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই আনন্দ নিশ্চিন্ত। তখন সে কায়মনোবাক্যে সমাহিত হতে পারবে তার সাধনায়। যে ইতিহাস আজও লেখা হয়নি— তারই

উপাদান সংগ্রহ করতে বসবে সে। একা নয়, তার মতো আরও অনেক সাধক আছেন—যাঁরা অতন্দ্র সাধনায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই হারানো ইতিহাসকে। আগাগোড়া নূতন করে লিখতে হবে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতো যা কিছু ভারতীয় তাকেই ছোট করে দেখলে চলবে না। তাই দেখাতে গিয়েই ভারতবর্ষের ইতিহাস বিকৃত হয়ে গেছে। দোষ ইতিহাসের নয়, দোষ ইংরাজের আমদানী করা ঐ 'কনকেভ মিরার'টার। ঐ বাঁকা আয়নাটায় সব কিছুই বিকৃত হয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। যাঁরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাঁদের ওই আয়নায় মনে হয় দেশদ্রোহীর মতো। আবার যারা সত্যিকারের সর্বনাশ করে গেছে দেশের তাদের প্রতিচ্ছবি পড়েছে দেশভক্তের ভঙ্গিমায়—যেহেতু তারা শাসক সম্প্রদায়ের সহায়তা করে গেছে। তাদের নামে ট্যাবলেট, তাদের নামে রাস্তা, তাদের কথা ওদের ইতিহাসের পাতায় সোনার জলে লেখা। এ ইতিহাস, আনন্দের মতে একেবারে পুড়িয়ে ফেলবে না। এরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। একটা পরাধীন জাতির ইতিহাসকে শাসক সম্প্রদায় কীভাবে গোপন করে, বিকৃত করে, তারই দলিল হয়ে থাকবে এসব গ্রন্থ।

নূতন করে লিখতে হবে আগাগোড়া। ঢেলে সাজাতে হবে। সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু আনন্দের ধারণা, সেটা করতে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা আবার উল্টোদিকে বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। সদ্য-স্বাধীন এ উপদ্বীপের নয়া-ইতিহাসবেত্তার দল যেন বেশিমাত্রায় উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু ভারতীয় তাই ভাল, এ কথা প্রচার করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। এ যেন ঐ 'কনকেভ মিরার'টিকে সোজা করতে গিয়ে তাকে 'কনভেক্স' করে ফেলা! প্রতিচ্ছবি এখনও স্বভাবিক নয়, উল্টোদিকে ভুল। আনন্দ বলে—ইতিহাসকারকে হতে হবে ন্যায়াধীশের মত, বিচারকের মত। যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে যেটুকু নিছক সত্য তাকেই তুলে ধরতে হবে। সে সত্য কঠোর হয় হোক, অপ্রিয় হয় হোক—তারই মূল্য দিতে হবে। সে বিচারে যদি দেখা যায় মা সন্তান হত্যা করেছে—অসম্ভব মনে হলেও সেকথা লিখে যেতে হবে রায়ে; সে বিচারে যদি দেখা যায় আজন্ম অপরাধীর কোন একটি বিশেষ অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তবে সে অপরাধ থেকে তাকে বেকসুর খালাস দিতে হবে। সেন্টিমেন্ট নয়—ন্যায়বিচার।

একনাগাড়ে অনেক কথাই বলে গিয়েছিল আনন্দ। শর্মিলা মন দিয়ে শুনেছে তার সব কথা। রাত্রি গভীর হতে শুরু করায় বিদায় চেয়েছে। উঠে পড়েছিল আনন্দ। রুমালটার কথা তার মনে ছিল না। শর্মিলাই সেটা কুড়িয়ে দিল ওর হাতে। কথা বলতে বলতে ওরা হাজরা পর্যন্ত চলে এল। সেখানে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে শর্মিলা রুখল সেটাকে। আর আশ্চর্য, ট্যাক্সি যখন ছেড়ে দিল তখন আনন্দ যুক্তকরে বিদায় দিল তাকে সহাস্য বদনে।

শর্মিলার মনে হল, লোকটা আজ ঘণ্টা-চারেক গল্প করার পরেও জানে না শর্মিলার নাম, ধাম, ঠিকানা !

নাঃ, আজ ঘুম কি আর আসবে না ? আবার উঠল শর্মিলা। বাথরুমে গেল। মুখেচোখে জল দিল। শোবার আগে আবার একবার চেয়ে দেখল ঘড়িটার দিকে। দুটো দশ ! আশ্চর্য ! ওদের ঝগড়া কখন মিটে গেছে, শর্মিলা টেরও পায়নি। ওরা তো আর মনের নয়, ঘড়ির কাঁটা। শীতকাতুরে বড় কাঁটাটা জড়িয়ে ধরেছে ছোট কাঁটাটাকে। সাড়ে এগারোটায় ওদের যে দাম্পত্য কলহ নজরে পড়েছিল শর্মিলার, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। জড়াজড়ি করে দুটো দশের ঘরে শুয়ে পড়েছে দুজনে।

ঘড়ির কাঁটা যা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পারে মনের কাঁটা তা একবছরেও পারে না কিন্তু !

পরদিন সকালে রমু যখন ওকে ডেকে দিল তখনও ঘুমের জড়িমা লেগে আছে শর্মিলার চোখে। মাথাটা ভার ভার, চোখ দুটো ভারি ভারি। রাতে ঘুম হয়নি ভাল। একেবারে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন। রমলার ডাকে বিরক্ত হয়ে উঠে বসে। একনাগাড়ে সে ডেকেই চলেছে—এই দিদি, তোর চা জুড়িয়ে গেল, নে ওঠ্। মুখে-আগুন চা না হলে তো আবার চলে না !

অগত্যা উঠতে হয়। সকাল হয়ে গেছে। কলকাতায় প্রথম শীতের সকাল। ধোঁওয়া ধোঁওয়া কুয়াশা জড়ানো। আলসেমোর সকাল। রাস্তায় জল দেওয়া শেষ হয়েছে। খবরেরর কাগজের হকারদল ছুটেছে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে। লোকজনের চলাফেরা শুরু হয়েছে পথে। পাশের ঘরে স্বাগতাও উঠেছেন। খুটখাট ঠুকঠাক শব্দ শোনা যাচ্ছে। একতলায় স্টোভ জ্বলছে এখনও। কতবার বলেছেন স্বাগতা কিন্তু জনার্দনের ওই এক বাতিক। কিছুতেই হীটারে জল বসাবে না। স্টোভ জ্বালা চাই। কোথায় কে বুঝি ইলেকট্রিক হীটারের শক্ খেয়ে মারা গেছে তাই জনার্দন ওটার ধারে কাছে যাবে না। যেন স্টোভ জ্বালতে গিয়ে দুনিয়ার কেউ কখনও মরেনি। কিন্তু তা হোক। স্টোভই ভাল। এমনি ভোর ভোর সকালে স্টোভের একটানা শব্দটা কেমন যেন নেশা ধরায়। চায়ের গন্ধ আর স্বাদের সঙ্গে ঐ শব্দটার কেমন যেন অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে। ওটাও যেন নেশার একটি আবশ্যিক উপাদান। বোধ করি দীর্ঘদিনের অভ্যাসে তাই এ শব্দটা এত ভাল লাগে। হুগলীর বাসাতেও সে সকালবেলা স্টোভ জ্বালতো।

না, আজ আর নয়। স্মৃতিচারণ কাল রাতেই শেষ হয়ে গেছে। আজ থেকে ওসব কথা আর নয়। জীবনের মাঝখানে দু-দুটো বছরকে একেবারে মুছে

ফেলতে হবে স্মৃতি থেকে। সেই বৃষ্টিঝরা দিনটি থেকে শুরু করে ওর এ বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত দিনগুলোকে মুছে দিতে হবে মন থেকে। নূতন দিনের সূর্যের আলো-কে সে কিছুতেই ঢেকে দিতে দেবে না ঐ দুটো বছরের কোনও মেঘের আড়ালে।

শর্মিলা নেমে পড়ে খাট থেকে। রমলার ইতিমধ্যে মুখটুকু ধোওয়া সারা। চায়ের কাপটা শর্মিলা টেনে নেয়। সত্যিই একটু জুড়িয়ে গেলে সে আর চা খেতে পারে না। আর সকালের এই চায়ের কাপটি না হলে ঠিক মাথা ধরবে। তখন যতই অ্যাসপিরিন আর স্যারিডন খাও, সেই রাত পর্যন্ত আধ-কপালে ধরে থাকবে।

রমু এই সাতসকালে চুল খুলে ফেলেছে। দিদির চেয়ে ওর চুলগুলো লম্বা, গুছিতেও বেশী। বড় চিরুণীটা দিয়ে চুলগুলো আঁচড়াচ্ছে রমলা।

—কোথাও বেরুবি নাকি?

—হ্যাঁ, গীতাদের বাসায় যাব একবার।

—কলেজ নেই আজ?

—আছে তো। সে তো এগারোটায়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে শর্মিলা বলে—হ্যাঁরে, নির্মল তো আজ আর কদিন আসছে না। কী হল, ঝগড়া করেছিস?

দাঁত দিয়ে ফিতে কামড়ে ধরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিকৃত কণ্ঠে রমু বলে—নির্মল আসুক না আসুক আজকে সেটা নিউজই নয়। আজ সকালের বিশেষ খবরের বুলেটিন বলছে, বোসবাড়িতে নিউ বটলে ওল্ড-ওয়াইন আজ বিকশিত হচ্ছেন।

শর্মিলা হেসে বলে—ফাজিল।

রমুও হেসে বলে—আমি তো ফাজিল, তুই কি? দাদাকে নাকি বলেছিস গাড়ি চাই না?

—গাড়ি কী হবে?

—বিকাশদাকে আনতে যাবে কে? দমদমে?

—কেন, তুই?

—তাহলে এয়ারোড্রোমেই বসে থাকবে সে। পরের প্লেনে ফিরে যাবে।

শর্মিলা জবাব দেয় না। জুত করে চা খেতে থাকে। মনে মনে সারাদিনের কাজগুলোর কথা একবার ভেবে নেয়। আজ তার অনেক কাজ। কাল কামাই করেছে। মাস্টারমশাই সম্ভবত ব্যস্ত হয়ে আছেন। মিঠুয়া নিশ্চয় ভীষণ রাগ করে বসে আছে। কাল শুধু শুধু কামাই করল সে। সমস্ত দিনটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছিল। সকালের ডাকে চিঠিখানা

আসতেই কেমন যেন সব গুলিয়ে গিয়েছিল। তারপর মা যখন বললে চিঠিখানা না পড়ে পুড়িয়ে ফেলেছে তখন আর তার মাথার ঠিক ছিল না। সারাটা দিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে। শান্তি পায়নি। বাড়িতে খায়নি, অফিসে যায়নি। দোতলা বাসের মাথায় বসে শুধু শুধু শ্যামবাজার ঘুরে এসেছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে ; বেলা একটা নাগাদ চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে ঢুকে কী-যেন খেয়েছিল। তারপর চলে এসেছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। চুপ করে বসেছিল সেই পরিচিত রেইন-ট্রি গাছের তলায়।

দিদি!

কী রে?

—কাল অফিসে যাসনি যে?

—কে বললে?

—সন্ধ্যাবেলা সেই মিনি মিত্তির এসে হাজির। বললে, তুই নাকি ফোন করে জানিয়েছিস যে জ্বর হয়েছে। তাই খবর নিতে এসেছিল।

ছি ছি ছি! মিনিটার সবতাতেই বাড়াবাড়ি একদিন কামাই করেছে তাতে এত হৈচে করার কী আছে? নাকি মাস্টারমশাই তাকে পাঠিয়েছিলেন নিজে থেকে? অসম্ভব নয়। যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ! ভগবান জানে, মিনিটা ফিরে গিয়ে কী বলেছে তাঁকে! কিন্তু তার আগে জানা দরকার এরা মিনিকে কী বলেছে।

—তা তুই কী বললি?

—আমি আর কিছু বলার স্কোপ পেলুম কোথায়? তার আগেই আমাদের বক্তিয়ার খিলজি বৌদি যে একগঙ্গা কথা বড়ু বড়ু করে বলে গেল।

—একগঙ্গা কথা মানে?

—মানে আজ বিকাশদা আসছে, তাই তুই কী সব মার্কেটিঙে গেছিস। আসল কথাটা বলেনি অবশ্য।

আসল কথা মানে?—ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে শর্মিলার।

আসল কথা মানে, আসল কথা। আনন্দদার চিঠির কথা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় শমু।

—রাগ করলি?

শর্মিলা জবাব দেয় না। রমু ঘনিয়ে এসে ডাকে—দিদি!

শর্মিলা চট করে উঠে পড়ে। ওর এই আদরের ডাকটাকে ভয় করে সে। রমুটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এখনি হয়তো ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলবে, আচ্ছা তুই আজও বিকাশদাকে আগেকার মতো ভালবাসিস? অথবা হয়তো, বিকাশদা আসছে শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে? কিংবা হয়তো একেবারে কাণ্ডজ্ঞান

হীনের মতো বলে বসবে, বিকাশদাকে তুই বেশী ভালবাসিস না আনন্দদাকে? রমুকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে।

—নে সরু। আমার দেরি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

চায়ের টেবিলে উপস্থিত হতেই সরমা বললে—কাল তোমার একখানা টেলিগ্রাম এসেছে।

—টেলিগ্রাম? কে করেছে?

অপরেশ ব্যাপারটা লঘু করে দেয়, বলে—বিশেষ কিছু নয়। বিকাশই করেছে দিল্লী থেকে। আজ সন্ধ্যার প্লেনে আসছে সেটাই কনফার্ম করেছে।

শর্মিলা হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামখানা নিল। এক নজর দেখে নিয়ে রেখে দিল ফের টেবিলে। কেমন যেন রাগ হল তার। আবার টেলিগ্রাফ করার কী ছিল? দুদিন আগেই তো চিঠি লিখে জানিয়েছে সে কথা। কবে, কখন, কোন ফ্লাইটে সে আসছে। তাহলে আবার বিশেষভাবে ওকে টেলি করার মানে? এয়ারোড্রোমে উপস্থিত থাকবার প্রচ্ছন্ন নির্দেশ? বিকাশের মনে কি সন্দেহ আছে যে শর্মিলা নিজে না গিয়ে আর কাউকে পাঠাবে? তাই যদি সে স্থির করে থাকত তাহলে এ টেলিগ্রাম এলেও তাই করত। কিন্তু শর্মিলা অত অভদ্র নয়। তারই জন্য বিকাশ আসছে, তাকে নিতেই আসছে। সারা জীবনের জন্য যখন লোকটাকে বরদাস্ত করতে রাজী হয়েছে তখন এ সাধারণ সৌজন্যবোধটুকুও আছে তার। ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি পাঠাতো না। কাল অবশ্য রাগের মাথায় দাদাকে বলেছিল গাড়ি চাই না। জানত তা সত্ত্বেও দাদা ঠিক সময়মত গাড়িটা পাঠিয়ে দেবে। শর্মিলার মনে হল টেলিগ্রাফখানার মধ্যে কেমন যেন একটা কাঙালপনা আছে। ওগো, আমি যাচ্ছি, তুমি নিজে একবার এয়ারোড্রোমে এস, আমাকে রিসিভ করবে। না হলে আমার মান থাকবে না। এ নেহাত হ্যাংলাপনা। আত্মবিশ্বাসের অভাব। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল তাই বা কেন? আনন্দও কি ঠিক এমনি করত না? প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে সে কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করেনি? কই, তখন তো সেটাকে হ্যাংলাপনা মনে হয়নি শর্মিলার। সে নিজেও কি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করেনি কারও প্রতীক্ষায়? ইস্যুকরা বইয়ের একটি ছত্র না পড়ে বসে থাকেনি দরজার দিকে দৃষ্টি মেলে? সেসব তো কাঙালপনা মনে হয়নি সেদিন।

স্বাগতা কিন্তু খুব খুশী হয়েছিলেন মনে মনে। খুব সময়মতো এসে পড়েছে তারটা। এরপর আর শমু বলতে পারবে না, আমি যাব না রিসিভ করতে। সেটা অভদ্রতার পর্যায়ে পড়বে। স্বাগতা বলেন—বিকাশের জন্যে দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটা একটু পরিষ্কার করে রাখিস।

এ নির্দেশ নিষ্প্রয়োজন নয় ঠিক। দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটা পরিষ্কারই আছে। বড়জোর একগোছা ফুল রেখে আসতে হবে ফুলদানীতে। এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে, বিকাশ একতলার গেস্টরুমে থাকবে না। বিকাশ গেস্ট নয়, বাড়িরই একজন।

বাদল হঠাৎ বলে বসে—দিদি, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব দমদমে। বিকাশদাকে রিসিভ করে আনতে যাব।

স্বাগতা রীতিমতো ধমকের সুরে বলে ওঠেন—না না। তোমার আর গিয়ে কাজ নেই।

কিন্তু স্বাগতার মনের কথা বাদল বেচারি বুঝবে কেমন করে? বিকাশ আর শর্মিলা আজ দেড়বছর বাদে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াবে। এই আঠারোটি মাসের মধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা বয়ে গেছে দুজনের উপর দিয়ে। এতদিন পরে দুজনে পরস্পরকে মেনে নিয়েছে, মনে নিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে উচ্ছ্বাসটা হঠাৎ একটু বেশী হয়ে পড়তে পারে। হয়তো প্রথম সাক্ষাতের উদ্দীপনায় দুজনে দুজনের মনের কাছাকাছি এসে পড়বে। সেটাই চাইছিলেন স্বাগতা। বাদলের উপস্থিতি শুধুমাত্র একটা অন্তরায়। বাদল অভিমান করে বললে—কেন, আমি গেলে কী হয়?

স্বাগতা বলেন—তোমার কি কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে? তুমি কী বলতে কী বলে বসবে তার ঠিক কি?

—কেন, সেবার যখন দাদা আনন্দদাকে নেমন্তন্ন করতে গেল আমি সঙ্গে ছিলাম না বুঝি? কি দিদি, কোন অসভ্যতা করেছিলাম?

হঠাৎ আনন্দের প্রসঙ্গটা এসে পড়ায় সবাই কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। কেমন স্থূল মনে হয় ঘটনাটা। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়। শর্মিলা আজ একজনকে আমন্ত্রণ করতে যাচ্ছে, বাদল তার সঙ্গে যেতে চায়; কারণ অপরেশ আর একবার আর একজনকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল যখন তখন বাদল সঙ্গে ছিল, এবং সেবার তার ব্যবহারে কোনও খুঁত ছিল না। তুলনাটা এটুকু পর্যন্তই টানা চলে। অন্তত বাদলের দৃষ্টি ভঙ্গি তাই।

রমলা ধমক দিয়ে ওঠে—তুমি চুপ করত। সব তাতেই খালি বায়না।

শর্মিলা সামলে নেয় নিজেকে—না না, বাদলও যাবে আমার সঙ্গে।

—না, বাদল যাবে না, রায় দেন স্বাগতা। কোথায় কী বলতে হয়, কী করতে হয়, তা কি ও জানে?

—জানি না? কেন, আমি কখন কাকে বেফাঁস কথা বলেছি বল?

—বলনি? ধমকে ওঠে রমলা, সেবার মিসেস্ খান্ডেলওয়ালাকে বলনি—মাঝপথেই সামলে নেয় রমু। মায়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে জিব কাটে। সকলেই চোখে চোখে তাকায়। স্বাগতা ধমকে ওঠেন সরমাকে—তখন থেকে কী

নাড়ছ অনবরত ? চাল না। জুড়িয়ে জল করে ফেলবে দেখছি তুমি।

শর্মিলার ভীষণ হাসি পায়। সে দেখতে পেয়েছে। বৌদি হাসি চাপতে পারেনি। প্রকাশ্যেই ফিক্ করে হেসে ফেলেছে। আর তাই একেবারে ক্ষেপে গেছেন স্বাগতা।

প্রসঙ্গটা হাস্যকর সন্দেহ নেই। বছর চারেক আগেকার কথা। বাদল তখন আরও ছোট। একদিন কোথায় বুঝি পার্টি ছিল স্বাগতার। বাসু সাহেবের যাবার কথা ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাটনা হাইকোর্টে যেতে হল বলে পার্টিতে যাওয়া হল না। কথা ছিল মিস্টার এবং মিসেস্ খান্ডেলওয়ালা যাবার পথে মিসেস্ বাসুকে তুলে নিয়ে যাবেন। স্বাগতা নিজের ড্রেসিংরুমে সাজগোজ করছেন, শমু রমু পড়ার ঘরে পড়াশুনা করছে। খান্ডেলওয়ালা দম্পতি কলিং বেল বাজাতে বাদল ছুটে এসেছিল তাঁদের আপ্যায়ন করে ড্রইংরুমে বসাতে।

খান্ডেলওয়ালা সাহেব বাঙলা জানেন অল্প। বলেছিলেন—ইজিস্ট মামী রেডি ? মা কি করিতেছেন ?

বাদল অম্লানবদনে বলেছিল— অলমোস্ট রেডি। ভুরু আঁকিতেছেন।

খান্ডেলওয়ালা সাহেবের বাঙলাজ্ঞান সীমিত। 'ভুরু আঁকিতেছেন' বাক্যটির মর্ম গ্রহণ করতে পারেননি বাদল তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কায়দাটা। আই ব্রো পেনসিলের মতো একটা পেনসিল নিজের ভুরুর উপর বুলিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল প্রক্রিয়াটা। হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন খান্ডেলওয়ালা দম্পতি।

এ নিয়ে এককালে অনেক হাসাহাসি হয়েছে এ বাড়িতে। কিন্তু ছেলের বউয়ের সামনে এ প্রসঙ্গটা রুচিকর মনে হয়নি স্বাগতার ; আর বউদিটাও বোকা। তার উচিত হয়নি অমন ফিক করে হেসে ফেলা।

অপরেশ জানে, এ-সব ক্ষেত্রে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। না হলে সরমাকে আরও ধমক খেতে হবে। তাই বলে—সাতটায় প্লেনটা ল্যান্ড করবে। পাঁচটার মধ্যে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব তাহলে। বাড়িতেই থাকবি তো ?

—না, আজ অফিসে যাব। কিন্তু গাড়ি তোমাকে পাঠাতে হবে না দাদা। আমি বরং একখানা ট্যাক্সি নিয়েই চলে যাব।

কাল গাড়িটা প্রত্যাখ্যান করে আজ একেবারে এক কথাতেই স্বীকার করে নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হল শর্মিলার। অপরেশ বাধা দিয়ে বলে—আবার ট্যাক্সি করতে যাবি কেন বাড়ির গাড়ি থাকতে ?

স্বাগতা এবারও ধমক দিয়ে ওঠেন— আচ্ছা, তোরই বা এত জেদ কেন ? ও যদি ট্যাক্সিতে যেতে চায় যাক্ না।

অপরেশ থতমত খেয়ে যায়। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না অন্যায়টা সে কী বলেছে। মান্যবর অতিথিকে আনতে হলে বাড়ির গাড়ি নিয়েই লোকে যায়। না হলে বিকাশকে তো দমদম থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনু পর্যন্ত ওরাই পেঁাছে দেবে। সেখানে গিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনের অফিসের সামনে ট্যাক্সি নিয়ে শর্মিলা অপেক্ষা করুক এই কি স্বাগতার মনোগত ইচ্ছা?

না, স্বাগতার মনোগত ইচ্ছা তা নয়। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার পশ্চাদ্ধাবন করবার ক্ষমতা নেই অপরেশের মতো নাবালকের। স্বাগতা ভাবছিলেন, বাড়ির গাড়ির চেয়ে ট্যাক্সিই তো ভাল। বাসু-সাহেবকে তিনি কতবার বলেছেন একটা পাঞ্জাবী কি মাদ্রাজী ড্রাইভার রাখতে। তা তিনি কানে তোলেননি কোনদিন। মহেন্দ্রকে যে তিনি কী চোখে দেখেছিলেন তা তিনিই জানতেন। এজন্য ভুগতে হয়েছে স্বাগতাকেই চিরকাল। গাড়ির মধ্যে মন খুলে কোন কথা বলার উপায় ছিল না। মহেন্দ্র বাঙালী। পিছনে ফেরে না অবশ্য, কিন্তু কান তো খোলাই থাকে। দমদম থেকে নিউ আলিপুরের দূরত্ব তো বড় কম নয়। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ওরা যদি জনান্তিকে দুটো কথা বলে নিতে চায় তো বলুক না। চাই কি হয়তো গঙ্গার ধার ঘুরেও আসতে পারে। ইচ্ছে হলে ঘাসের উপর বসতেও পারে দু-দণ্ড। মহেন্দ্র গাড়ি চালালে কি তা সম্ভব? শেয়ার ঘেঁটে ঘেঁটে ছেলেটার মনের রসকষ সব গেছে শেষ হয়ে। যাবে না? নিজে পছন্দ করে বউটিও যে জুটিয়েছেন এক আকাট মুখ্যু। বউ নিয়ে যেদিন বের হয় সেদিনও নিজে গাড়ি চালায় না বলে—চল মহেন্দ্র, আমরা একটু মার্কেটে যাব। মার্কেট, মার্কেট আর মার্কেট—এ ছাড়া যেন দুনিয়ায় আর যাবার জায়গা নেই কোথাও!

অনেক ভেবেচিন্তে কিছু আন্দাজ করতে না পেরে অপরেশ আবার বলে—না, আমি ভাবছিলাম ঠিক সন্ধ্যাবেলায় আবার ট্যাক্সি পাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়ে কিনা। আমি তো শত চেষ্টা করেও পাই না।

রমু হেসে বলে—তুমি পাও না, কারণ তোমার জন্য সর্বদা মহেন্দ্র গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে। আমরা পাই, কারণ না পেলে ট্রামে-বাসে ঝুলতে হয় আমাদের। কি বল দিদি?

পৈতৃক গাড়ি একখানাই। এজমালি সম্পত্তি। বোনেদের অভিযোগ সেটা দাদার পিছনেই খাড়া থাকে সর্বক্ষণ। অপরেশ সেটা মানে না। এ অভিযোগের উত্তরে তার সরব প্রতিবাদ সর্বদা উদ্যত। সে কিছু বলতে যাবার আগেই শর্মিলা বলে—সে কথা ঠিক বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ট্যাক্সি চাপি আমি, আর তারপরে রমু—

অর্থাৎ বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাড়ির গাড়ি ব্যবহার করে দাদা, এই তো বলতে চাস্?

শর্মিলা সকৌতুকে বলে—ওটা তোমার গিল্‌টি-কন্‌সাস মনের ইন্‌ফারেন্স, আমার স্টেটমেন্ট সে কথা বলেনি।

নিছক কৌতুক। ভাইবোনের খুনসুটি। অনাবিল পারস্পরিক লেগ-পুলিং। কিন্তু তাতেও হঠাৎ যেন জ্বালা ধরে গেল অপরেশের। ঝাঁজের সঙ্গে বলে—আমি তো জানি, জীবনে একবারই ট্যাক্সি ডেকেছ তুমি এবং জলকাদার মধ্যে ড্রাইভার তোমাকে কোন খানা-খন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

রাগের মাথায় কথাটা বলেই মনে মনে জিব কেটেছিল অপরেশ—ছি ছি ছি। এ কথা কি এভাবে বলার? এই পরিবেশে! বিশেষ আজকের মতো শুভদিনে?

ঘরটা থম্‌থম্‌ করছে। ঠিক কালকের মতো কি একটা ছুতো করে সরে পড়ল সরমা আর রমু। শর্মিলা কোন ছুতো করলে না, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সে। স্বাগতা শুধু আত্মগতভাবে বললেন—বাদলের আর দোষ কি? কোথায় কি বলতে হয় ধেড়ে ছেলে তুমিই তা শিখলে না অ্যাদ্দিনেও!

মরমে মরে গেল অপরেশ।

রোজ অপরেশ সাড়ে আটটায় অফিসে চলে যায়। গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে মহেন্দ্র। শমু-রমুকে নিয়ে যায়। একজন নামে প্রেসিডেন্সিতে আর একজন হেদোর কাছাকাছি। ওখানেই শর্মিলার স্কুল। স্কুল নয় আশ্রম, বিশ্ববন্ধু আশ্রম। সাড়ে দশটার মধ্যে শর্মিলাকে হাজিরা দিতে হয়। ফেরার পথে শর্মিলা সাধারণত বাসেই ফেরে। অথবা ট্যাক্সিতে। আজ কিন্তু শর্মিলা জিদ ধরল তাকে সকাল করে যেতে হবে। স্বাগতা বুঝলেন। গাড়িতে না যাবার জন্যেই এই জিদ। রাগ হয়েছে মেয়ের। দাদার উপর শোধ তোলা হচ্ছে। কে জানে কতদিন চলবে এখন এই জেদাজেদির পালা। বাড়িতে আজ বাইরের লোক আসবে, আর গাড়ি নিয়ে এই জেদাজেদি চলতে থাকবে। অপরেশ একবার ভয়ে ভয়ে বললে—আমিই না হয় আজ ট্যাক্সি নিয়ে যাই। তুই বরং মহেন্দ্রকে নিয়ে যা।

শর্মিলা জবাবে বলেছিল—তুমি কিসে যাবে তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। আমার গাড়ি লাগবে না।

সত্যিই ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যাবে সে। বাসেই যাবে। স্বাগতা কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। জানেন ব্যারিস্টার-সাহেবের আদরেই হয়েছে এসব। যা ধরবে তাই করবে।

চাকরি নেওয়া নিয়েও একদিন এই রকম জেদাজেদি হয়েছিল। কারও কথায় কান দেয়নি জেদি মেয়েটা। জিদ করে চাকরিটা নিল। কটা টাকাই

বা পায় ? যা পায় তা বোধ হয় যাতায়াতেই খরচ হয়ে যায়। প্রথমটা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত স্বাগতা রাজী হয়েছিলেন। আনন্দের সঙ্গে রাগারাগি করে চলে আসার পর চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকত। স্বাগতার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না - কিন্তু কোন কিছুতেই সে মাথা গলাবে না। লাইব্রেরীতে যাবে না, পাড়ার মেয়েদের নিয়ে একটা মহিলা-সমিতি গড়ে তুলেছিলেন স্বাগতা- শর্মিলাকে সেদিকেও ভেড়ানো গেল না। সবাই মিলে একটা চ্যারিটি শো করবেন স্থির করেছিলেন, শুধু শর্মিলাকে কোন ভাবে কাজে কর্মে ভুলিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু শর্মিলা কিছুতেই কোন দায়িত্ব নিতে রাজী হল না। আনন্দের সংসার থেকে শর্মিলা যে রাগারাগি করে চলে এসেছে সে কথাটা বুঝতেই পারেননি প্রথমটায়। ওঁর দোষ নেই। তখন অপরেশের বিয়ের ব্যাপারে সত্যই ব্যস্ত ছিলেন তিনি। প্রথম খটকা লাগল বিবাহে একমাত্র জামাই না আসায়। ভয়ানক অপমানিত বোধ হয়েছিল স্বাগতার। অপরেশ নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। তার না আসার মানে ? কিন্তু কোন কথা তিনি বলেননি। মনে মনে শঙ্কিত ছিলেন অবশ্য জামাইয়ের ব্যাপারে। এলেও বিব্রত বোধ করতেন। ভদ্রলোকদের সামনে বার করবার মতো মানুষ তো নয় তাঁর বড় জামাই। তবু সে যে আসবে না, এটা ভাবতেই পারেননি। আরও বিস্মিত হয়েছিলেন তার পাঠানো প্রেজেন্টেশানটা দেখে। শর্মিলার উপহারটাই টেক্কা দিয়েছিল সবার উপর। মনে মনে খুশী হয়েছিলেন স্বাগতা। শর্মিলাকে ডেকে বলেছিলেন—এবার একদিন আনন্দকে আনতে গাড়ি পাঠাই ?

শর্মিলা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল—না।

—না মানে ?

—এ বাড়িতে সে আসবে না। এ বাড়ি ছেড়ে আমিও যাব না।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন স্বাগতা। ধীরে ধীরে সব কথা জেনে নিয়েছিলেন। শর্মিলা স্বীকার করেছিল সব অপরাধ,—হ্যাঁ, ভুলই করেছিল সে। বলেছিল মাকে—ও মানুষকে নিয়ে ঘর করা যায় না।

জ্বলে উঠেছিলেন স্বাগতা - সেটা এতদিনে বুঝলে ?

শর্মিলা হাসপাতাল থেকে একা ফিরে আসার পর আশার আলোক দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। নূতন ধারায় বইতে শুরু করল তাঁর চিন্তা। শর্মিলার আবার বিয়ে দেবেন। সে কথা বলতেই জ্বলে উঠেছিল শর্মিলা। স্বাগতা বুঝেছিলেন, কালে সবই সয়ে যাবে। ক্রমে শর্মিলা রাজী হবে। সময় ভুলিয়ে দেবে তাকে। তখন থেকেই বিকাশের কথা মনে হয়েছিল তাঁর। এতদিনে তাঁর সে স্বপ্ন স্বার্থক হতে বসেছে। কিন্তু এই কয় মাস সে জন্যে কী অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। হাসপাতাল থেকে

ফিরে আসার পর শর্মিলা একেবারে অনাসক্ত হয়ে পড়েছিল। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কোথাও বের হয় না। সে এক অদ্ভুত মেলাঙ্কোলিয়ায় পেয়ে বসেছিল শমুকে। সেটা শর্মিলার 'ব্লু-পিরিয়ড'! স্বাগতা শেষে একদিন রাগ করে বলেই ফেললেন— তুই কী চাস্ বল তো?

অবাক চোখে তাকিয়ে শর্মিলা বলেছিল কী চাই মানে?

—তুই কোথাও বের হবি না, হাসবি না, খেলবি না—তুই কি আত্মঘাতী হতে চাস্?

শর্মিলা একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিল—আমি একটা চাকরি নেব ভাবছি।

—চাকরি! কেন, তোর কি খাওয়ার পয়সা জুটছে না?

—না, সেজন্যে নয়, কিন্তু একটা কিছু নিয়ে তো আমাকে থাকতে হবে।

একটু ভেবে নিয়ে স্বাগতা বলেছিলেন—কাজটা কী? কোথায়?

যতটুকু না বললে নয় ততটুকুই বলেছিল শর্মিলা। কাজটা কোথায়, কী জাতীয় তা বলেছিল, শুধু বলেনি জগদানন্দবাবুর সঙ্গে কেমন করে আলাপ হল তার। বলেনি, এই জগদানন্দবাবু আনন্দের মাস্টারমশাই এবং আনন্দের মাধ্যমেই সে প্রথম পরিচিত হয়েছিল জগদানন্দবাবুর সঙ্গে।

স্বাগতা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন। পঙ্গু আতুর নিয়ে ভুলে থাকতে চায়, থাকুক না—ভাবখানা তাঁর এই রকম। এও তো এক ধরনের দেশ-সেবা।

শর্মিলা যোগ দিয়েছিল তার কাজে।

জগদানন্দবাবু ছিলেন আনন্দের জেলাস্কুলের হেডমাস্টার। দিলখোলা আত্মভোলা মানুষ। যেমন ছাত্র তেমনি মাস্টারমশাই। জীবনের শুরু করেছিলেন ঐ স্কুলের থার্ড মাস্টার রূপে। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন ঐ একই বিদ্যায়তনে। শেষ বারো বছর হেডমাস্টার হিসাবে। তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। তারা বড় বড় চাকরি করে, ব্যবসা করে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারা। জগদানন্দবাবু তাতেই খুশী। ভদ্রলোক বুনো রামনাথের জাতের মানুষ। যে পরিবেশে যখন থাকেন, তখন তাতেই সন্তুষ্ট। ছাত্রেরা মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, দেখা হলে নত হয়ে প্রণাম করে— বৃদ্ধ তাতেই তৃপ্ত। অল্পেই চোখে জল আসে তাঁর। সেন্টিমেন্টাল মানুষ। সংসারে কেউ নেই। স্ত্রী গত হয়েছেন অনেকদিন। মেয়ে দুটির বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে নেই। নেই, তিনি স্বীকার করেন না, বলেন আমার ছেলে তো সারা দেশে ছড়ানো। জগদানন্দবাবু স্থির করেছিলেন, প্রভিডেন্ট-ফান্ডের টাকাটা হাতে এলে কাশী চলে যাবেন! বার্ধক্যে বারাণসী। কিন্তু সে সুযোগ তাঁর আর হল না। তাঁর একটি প্রাক্তন-ছাত্র এসে হাজির হল রিটায়ার করার পরেই, বিচিত্র এক প্রস্তাব নিয়ে।

মনীশ বাগচি ওঁর একজন প্রিয় ছাত্র। প্রিয় এবং কৃতী। স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছিল বহরমপুর থেকে। ওঁর স্কুলের গৌরব। বরাবর ফার্স্ট হয়ে ডিঙিয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপের পর ধাপ। পরবর্তী যুগে ছাত্রদের তিনি মনীশের উদাহরণ দেখাতেন, বলতেন ঐ রকম হতে হবে তোমাদের! সেই মনীশ একদিন এসে দাঁড়াল তাঁর দরজায়, দীর্ঘ পনের বছর পর। বললে—হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি স্যার। চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই যাবার আগে প্রণাম করে যেতে এসেছি আপনাকে।

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ বলেছিলেন—শুনেছি তোমার দুঃখের কথা। আশীর্বাদ করি ঈশ্বর তোমাকে এ দুঃখ বইবার শক্তি দিন।

হাত দুটি জোড় করে মনীশ বলেছিল—একটি ভিক্ষা আছে স্যার।

বল মনীশ। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

—কিছু পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলুম, কিছু নিজেও করেছি। সেটা সৎ কাজে দান করে যেতে চাই। আপনাকে তার ভার নিতে হবে।

—কী জাতীয় ভার?

মনীশ তার প্রস্তাব পেশ করে। তার ভদ্রাসনখানি সে দান করে যেতে চায়। শুধু ভদ্রাসনই নয়, স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি। সামান্য পাথেয়টুকু নিয়ে সে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যেতে চায় এ দেশ ছেড়ে। মনীশের ইচ্ছে ওর পৈতৃক ভিটায় খোলা হবে একটা শিক্ষায়তন। মনীশের ঠাকুরদা ছিলেন উত্তর কলকাতার একজন নামকরা ধনী। প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছিলেন তিনি। হেদোর কাছাকাছি তৈরী করিয়েছিলেন প্রাসাদোপম ভদ্রাসনটি। মনীশের বাবাও যথেষ্ট উপার্জন করেছেন। মনীশ নিজেও কম করেনি। কিন্তু কিছুই তার ভোগে লাগল না। মনীশের ইচ্ছা তাদের সেই পৈতৃক ভিটায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হবে। জনা দশ-পনের ছাত্র থাকবে তাতে। কিন্তু সেখানে ভর্তি করা হবে একমাত্র বিকলাঙ্গদের। যারা অঙ্গহানিজনিত কারণে সাধারণ স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পারে না, তাদের। শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে তদনুযায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত ক্যারিকুলাম অনুসরণ করা হবে কি হবে না, তা নির্ধারণ করবেন মাস্টারমশাই। উদ্দেশ্য হবে, সেই সব বিকলাঙ্গদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। উপার্জনক্ষম করে তোলা। ভাষা, বিজ্ঞান ইতিহাস, ভূগোলও হয়তো তাদের পড়াতে হবে—যাতে পূর্ণাঙ্গদের সমাজে মেলামেশা করার সময় তারা কথাবার্তায় অসুবিধা বোধ না করে; কিন্তু প্রধান লক্ষ্য হবে দুটি। প্রথমত এবং প্রধানত তারা যেন উপার্জনক্ষম হয়—পরিবারের ঘাড়ে যেন তারা বোঝাস্বরূপ না হয়। দ্বিতীয়ত একটি বা দুটি অঙ্গহানিজনিত কারণে তারা যেন পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দরস থেকে বঞ্চিত না হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মনীশ তার যাবতীয় সম্পত্তি দান করে যেতে চায় একটি ট্রাস্টিকে—আর

জগদানন্দবাবুকে করে রেখে যেতে চায় তার কর্ণধার। সলিসিটারকে দিয়ে একটা খসড়া সে তৈরি করে এনেছিল। সেটি তাঁর হাতে দিয়ে বলে—পড়ে দেখুন।

জগদানন্দবাবু অস্বীকার করতে পারেন নি। বলেছিলেন—বেশ, তোমার দেওয়া এ দায়িত্ব আমি নিলাম; কিন্তু তুমিই বা চলে যাচ্ছ কেন? এ তো আমার মতো বৃদ্ধের একার কাজ নয়। তুমিও থাক না এতে জড়িত।

হাত দুটি জোড় করে মনীশ বলেছিল, ওটি আদেশ করবেন না স্যার। অনেক ভেবে দেখেছি। সে আমি পারব না কেন পারব না তা বুঝতে পারবেন এই ডায়েরিখানা পড়লে। এটা আমি আপনার কাছে রেখে যেতে চাই সেটিমেন্টাল কারণে নয়, এটা একটা হিউম্যান ডকুমেন্টারি। অপরিণত একটি বিকলাঙ্গ মানুষের মানসিক পরিবর্তনের দলিল। আমি আপনাকে অনুরোধ করব মাস্টার মশাই, যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে আসবেন, তাঁদের আপনি এটা পড়তে দেবেন। তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, একটি অপরিণত কিশোর কী ভাবে, কী চায়, কী করে।

—কিন্তু তুমি কেন নিজের মনকে শক্ত করছ না মনীশ? মন্টুর স্মৃতিরক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছ, নিজের হাতে কেন তা বানাচ্ছ না?

একটু চুপ করে থেকে মনীশ বলেছিল—আমি অক্ষম, আপনি আমাকে মাপ করবেন। এ বাড়িতে, এ দেশে আমি আর টিকতে পারছি না। বছর কতক বাইরে থেকে ঘুরে আসি। মাসে মাসে সেখান থেকে আমি টাকাও পাঠাব। টাকারও তো দরকার হবে আপনাদের। মনে যদি শান্তি পাই, তাহলে ফিরে আসব আবার। কিছুদিনের মত শুধু মুক্তি দিন আমাকে।

শর্মিলা কাজে যোগ দেবার পর সেই দিনলিপিখানি পড়তে পেয়েছিল। পড়েছিল সে যত্ন করে আদ্যোপান্ত। একবার নয়, বারে বারে।

মনীশ বাগচি ইকনমিক্সের ছাত্র। পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিল প্রচুর, নিজেও রোজগার করেছে যথেষ্ট। বিবাহ করেছিল, সন্তানও হয়েছিল একটি। মন্টু। ভাল নাম বিশ্ববন্ধু বাগচি। তার নামেই এ প্রতিষ্ঠানের নাম। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল মন্টু। হিন্দু স্কুলের ফার্স্ট বয়। মাস্টার-মশাইরা আশা করতেন বাপের মতো সেও রেকর্ড মার্ক নিয়ে পাশ করে যাবে সব পরীক্ষা। প্রতিষ্ঠিত হবে জীবনে। ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত মনীশ। ছেলেকে কেন্দ্র করেই ঘুরত ওদের দাম্পত্য জীবন। প্রাইভেট টিউটার ছিল না। বাবা মা-ই পালা করে পড়াতো তাকে। মাও ভাল ছাত্রী। আশা ছিল, এ ছেলে একদিন দেশের আর দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। মনীশের সুখের সংসার একটি মুহূর্তে ভেঙে চুরে খানখান হয়ে গেল। সর্বস্বান্ত হয়ে গেল সে এক মোটর দুর্ঘটনায়। মন্টুর মা ঘটনাস্থলেই মারা

গেলেন। হাসপাতালে পৌঁছাবার আগেই। আর মন্টু সেখান থেকে ফিরে এল বটে কিন্তু দুটো পাই কেটে বাদ দিতে হয়েছে হাঁটু থেকে। গ্যাংগ্রিন হয়ে যাচ্ছিল। আর আশ্চর্য! কয়েকটা কাটা দাগ ছাড়া মনীশের দেহের চামড়ায় আর কোন চিহ্ন নেই সেই ক্ষণিক বিভীষিকার।

মোড় ঘুরে গেল জীবনের। স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে ছেলেকে বাড়িতে এনে রাখতে হল। তার সঙ্গী নেই, সাথী নেই, মনীশ দীর্ঘ দিনের ছুটি নিল। সেই তখন একমাত্র সঙ্গী বিকলাঙ্গ পুত্রের। সারাদিন তাকে ভুলিয়ে রাখে, গল্প বলে, বই পড়ে, ক্যারাম খেলে। কিন্তু কতদিন আর এভাবে চলে? শেষ পর্যন্ত আবার একদিন কর্মজগতে ফিরে যেতে হল মনীশকে। দীর্ঘ পাঁচটি বছর কেটে গেল তারপর। এ পাঁচ বছরের প্রতিদিনের ইতিহাস মনীশ লিখে গেছে তার খাতায়। মন্টু কী করে, কী চায়, কী বলে। কেমন করে তাকে সঙ্গদান করবার চেষ্টা করেছে, কেমন করে তাকে কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে তার ইতিবৃত্ত। হাতে-চালানো তিন চাকার সাইকেল বানিয়ে দিয়েছিল, তাই চালিয়ে বাড়ির বাইরেও যেত। বাইরের দুনিয়াটার প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বেশি। সময় পেলেই সে বেরিয়ে যেতে চাইত। আবার কখনও কখনও পাঁচ-সাত দিন একেবারেই বের হত না। মনীশ ভাবত, হয়তো কেউ ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলেছে, হয়তো নতুন করে আঘাত পেয়েছে সে। মন্টু ভারি চাপা ছেলে, কোন কথাই সে বলতে চাইত না। পাড়ার কয়েকটি ছেলেও আসত। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে মেতে উঠত, কিন্তু আবার কখনও তাদের উপর অভিমানে চুপচাপ পড়ে থাকত বিছানায়। মনীশ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সবকিছু সত্ত্বেও মন্টুকে খুশী রাখতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পনের বছর বয়স তখন মন্টুর। দশ বছরে সে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। সেই পনের বছর বয়সের কিশোরটির কী যে হল হঠাৎ, বাপের উদ্দেশ্যে একটি ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে আত্মঘাতী হল বিশ্ববন্ধু। সেই ছোট্ট চিঠিখানিই এ প্রতিষ্ঠানের মূল দলিল। তাতে লেখা আছে—'এ দেশে বিকলাঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।'

মন্টুর কাছে হেরে গিয়েছিল মনীশ। পুত্রের কাছে পরাজয়ই নাকি কাম্য। কিন্তু এ কি সেই পরাজয়? মনীশ সে হার স্বীকার করেনি। জীবনে কখনও কারও কাছে হার স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না সে। স্কুলে-কলেজে কর্মজীবনে সে চিরকাল মাথা উঁচু করেই থেকেছে। পুত্রের কাছেও এ পরাজয় সে মেনে নিতে পারেনি। তার লেখা শেষ-চিঠির স্ট্রেটমেন্টালিটিকেও সে অস্বীকার করেছিল। তার আজীবনের সঞ্চয় দিয়ে তা প্রমাণ করবার এই প্রচেষ্টা মনীশের।

জগদানন্দবাবু মাথা পেতে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গড়ে উঠল নূতন

প্রতিষ্ঠান। স্বতঃস্ফূর্ত দান এল কিছু আপনা থেকেই। যারা মনীশকে চিনত, মণ্টুকে জানত, তারা অযাচিতভাবে দান করল সাধ্যমতো। এমনকি মণ্টুর স্কুলের ছেলেরা, মাস্টারমশায়েরা চাঁদা তুলে তার এ স্মৃতিকে সম্মান দেবার চেষ্টা করলেন। জগদানন্দবাবুর আর কাশীবাসী হওয়া হল না, মনেপ্রাণে তিনি ডুবে গেলেন এ প্রতিষ্ঠানের কাজে।

আনন্দ বিয়ের পরে এ গল্পটা করেছিল শর্মিলাকে। ওরা তখন হুগলীতে। শর্মিলা দেখতে চেয়েছিল। একটা ছুটির দিন ওরা তিনজনে গিয়েছিল মাস্টার মশাইয়ের কাছে। শর্মিলা, আনন্দ আর উমা। জগদানন্দবাবু খুব খুশী হয়েছিলেন পুরাতন ছাত্রকে পেয়ে। শর্মিলা তাঁকে প্রণাম করে বলেছিল, আমিই কিন্তু আপনার ছাত্রকে ধরে এনেছি।

মাস্টার-মশাই খুশী হয়ে বলেছিলেন, তাই তো আনতে হবে মা। এ তো তোমাদেরই কাজ। ওরা এখন কাজের মানুষ, তোমরাই তো মনে করিয়ে দেবে।

তারপর ওকে বলেছিলেন আনন্দ ছেলেটা ভারী ভাল, বুঝলে। তুমি সুখী হবে।

সে কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায় শর্মিলার। মাস্টার-মশায়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। আনন্দ ভাল ছেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু বড় বেশী ভাল সে। অত ভালকে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায়, শো-কেসে বসিয়ে দূর থেকে তারিফ করা চলে। তাকে নিয়ে ঘর করা চলে না। শর্মিলা তাই সুখী হতে পারেনি।

কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যখন সে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় পাগল হয়ে যেতে বসেছিল তখন এই মাস্টার-মশাইটির কথাই আবার মনে পড়েছিল তার। ছুটে গিয়েছিল তাঁর কাছে একদিন।

জগদানন্দবাবু আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—আজ যে আমার মা একা এসেছে? কই, আমার ছেলে কই, তাকে আননি?

উত্তর দিতে গিয়ে জবাবটা আটকে গিয়েছিল ওর গলায়। তবু থামেনি। বলেছিল কিছুটা। সব কথা বলা যায় না। তবু যতটুকু বলেছিল ততটুকুই শুনেছিলেন বৃদ্ধ। জানতে চাননি কেন এ বিরোধ, কেন আনন্দকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে এসেছে শর্মিলা। কেন তার আশ্রয়ে ফিরে যাবার সম্ভাবনাটাকে একেবারেই আমল দিতে চায় না সে। বলেছিলেন, কিন্তু মানুষের মন তো, কেমন করে জানলে যে আজকের তোমার দৃঢ় সংকল্পটাও শরতের মেঘের মতো ভেসে যাবে না।

শর্মিলা মাথা নিচু করে বলেছিল—জীবনে এমন বাধা আছে যা অনতিক্রম্য। এমন ভুল হয়, যা শোধরাবার উপায় নেই।

বৃদ্ধ চুপ করে গিয়েছিলেন।

শর্মিলা কুণ্ঠাভরে বলেছিল · তাঁর কোন চিঠিপত্র পান না ?

—সে যে পাগল ছেলে মা, তা তো তুমি জানই। কোনদিনই সে চিঠিপত্র লেখে না।

হাত দুটি জোড় করে শর্মিলা বলেছিল—একটা ভিক্ষা আছে মাস্টার-মশাই।

ভিক্ষা কেন মা ? আমার উপর যে তোমার দাবী আছে। বল।

আমাকে আপনি কিছু কাজ দিন। চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে আমি পাগল হয়ে যেতে বসেছি।

—এই কথা ? তা নাও না, কত কাজ করবে তুমি কর।

একটা চাবির গোছা বাড়িয়ে ধরে বলেন—নাও, ধর।

· কী এটা ?

আমাদের সিন্দুকের চাবি।

পিছিয়ে এসেছিল শর্মিলা—না না, টাকা পয়সা নয়, আমি ছোটদের মধ্যে থাকতে চাই— ওই যাদের হাত-পা-চোখ নেই। আমি ওদের কয়েকটা ক্লাস নিতে চাই মাত্র।

বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন—ক্লাস নেবার লোকের আমার তো অভাব নেই মা। সেটা আমি নিজেই পারি। সারাজীবন ঐ একটা কাজই তো শিখেছি। কিন্তু বিশ্বাসী একটি লোকের হাতে এই চাবির গোছাটা তুলে দিতে না পারলে যে আমি মন খুলে ওদের নিয়ে ক্লাস করতেও পারি না।

অগত্যা সেই দায়িত্বই নিতে হয়েছিল শর্মিলাকে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন—তুমি এলে, আমি বাঁচলাম। গত মাস থেকে তিনটি মেয়েকেও ভর্তি করেছি আমরা। একটি মহিলা কর্মীই খুঁজছিলাম। বিশেষত মিঠুয়ার জন্য।

· মিঠুয়া কে ?

—এখনই আলাপ হবে। উপরে আছে, চল, দেখা করে আসি।

সেই প্রথম দিনই মিঠুয়াকে ভালবেসে ফেলেছিল শর্মিলা। মেয়েটি ছোট। বছর আষ্টেক বয়স। পোলিও হয়ে নিম্নাঙ্গটা অবশ হয়ে গেছে। পা দুটি আছে, কিন্তু তাতে জোর নেই। চাকাগাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্যে।

শর্মিলা প্রথম প্রথম যেত শুধু সময় কাটাতে। ক্রমে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে ভালবেসে ফেলেছে সে। জগদানন্দবাবু ওকে পেয়ে বেঁচেছেন। তার উপর ধীরে ধীরে ন্যস্ত করেছেন সব দায়িত্ব। এখন একদিন যদি সে না আসে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে শহরের গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তিও যুক্ত হয়েছেন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসাবে। সরকারী সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। তাহলে আয়তনে এটাকে বাড়াতে হবে। মনীশ বিদেশ থেকে

লিখেছে হয়তো কিছু বৈদেশিক সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে। লিখেছে ওদেশের প্রতিষ্ঠানের কথা। ওরা খঞ্জকে দিয়ে পর্বত লঙ্ঘন করাচ্ছে। ফটো তুলে পাঠিয়েছে একটি চিত্রকরের। তার দুটি হাতই কাটা। মুখে তুলি ধরে সে যে ছবি এঁকেছে, কয়েক হাজার ডলারে তা বিক্রি হয়েছে ওদেশের বাজারে। জগদানন্দবাবু জনে জনে সে ছবি দেখিয়েছেন। দৃঢ়স্বরে বলেছেন—ভাবছ কি, আমাদের দেশের ছেলেরাও তা পারবে।

শর্মিলা ঠিক বিশ্বাস করে না; আবার জগদানন্দবাবুর উৎসাহ দেখে অবিশ্বাস করতেও পারে না।

দিদি, তুই আগে যাবি, না আমি ঢুকব?

—না না, আমি আগে সেরে নিই। কাল কামাই করেছি, আজ সকাল সকাল যেতে হবে।

—তাহলে ঢোক্। আমাকেও একটু সকাল করে বেরুতে হবে। গীতাদের বাড়ি হয়ে যাব।

– কলেজ থেকে ফেরার পথেই বরং সেখানে যাস্ না?

—ওরে বাবা। তা হবার নয়। মা আজ সকাল করে ফিরতে বলেছে। একগাদা বাজার করতে পাঠিয়েছে জনার্দনকে। ওবেলা মা যে গ্রান্ড ডিনার খাওয়াবে।

—তাই নাকি? তুই তো অনেক খবর রাখিস।

—রাখতে হয়। বাড়িতে আজ সম্মানিত অতিথি আসছেন শুনিসনি?

শর্মিলা জবাব দেয় না। শাড়ি-ব্লাউস-তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। শয়নকক্ষের সঙ্গে লাগাও স্নানঘর। দু-বোনের এজমালি সম্পত্তি। বস্তুত শর্মিলার বিয়ে হয়ে যাবার পর এ ঘর এবং লাগাও বাথরুমটির উপর বছরখানেক রমলার ছিল অসপত্ন অধিকার। শমু ফিরে আসার পর আবার দুজনে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে ঘরখানা, ছেলেবেলায় যেমন করত। রমুর তাতে আপত্তি নেই।

বাথরুমের এই ছোট্ট পরিবেশটি শর্মিলার ভারি পছন্দসই। ওডিকোলন, ক্যাস্থারাইডিন আর জবাকুসুমের একটা মিলিত মৃদু গন্ধ। রমু ক্যাস্থারাইডিন মাখে। শর্মিলা কিন্তু বরাবর জবাকুসুমের ভক্ত। এমন কি আনন্দের অভাবের সংসারেও সে বরাবর তার এই প্রিয় তেলটি ব্যবহার করত। আনন্দকেও সে মাখতে বলত কিন্তু তার কি মাথার ঠিক আছে? আজ সরষের তেল, কাল নারকেল তেল তো পরশু রুক্ষস্নান। ওঃ যা! তেল মাখতে ভুলে গেছি!

ঝকঝকে ওয়াশ-বেসিন। ফেনশুভ্র শাওয়ার। মোজেইক মেঝে

আর ড্যাডো। তাছাড়া একটি প্রমাণ আয়না। বাথরুমের এই প্রমাণ আয়নাটা বড় প্রিয় শমুর। ওর সামনে দাঁড়ালে যে মেয়েটি আজও শমুর সামনে এসে দাঁড়ায় তাকে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে সে। কতবার কতভাবে দেখেছে তাকে। প্রথম কৈশোরের সেই অবাক দিনগুলিতে ওকে কত কথা বলেছে শর্মিলা শাওয়ার বাথ খুলে দিয়ে। আজও সে মেয়েটি এসে দাঁড়ায় ও বাথরুমে ঢুকলে বিয়ের আগে কতবার ওরা দুটি বোন এই বাথরুমে একসঙ্গে স্নান করেছে। গল্প করতে করতে সাবান মেখেছে। একজন আর একজনের মাথায় শ্যাম্পু করে দিয়েছে। এখন আর তা পারে না। এখন কেমন যেন লজ্জা করে। এখন ওরা বড় হয়ে গেছে। যদিও সবই জানা, তবু কেমন যেন সংকোচ হয় একজনের পর একজন স্নান সেরে নেয়। ঐ আয়নাটায় কতবার পড়েছে ওদের যুগল স্নানের ছবি। এখন আর শর্মিলা আয়নাটার দিকে বিশেষ তাকিয়েও দেখে না। তার কৌতূহলেরও বোধ হয় অবসান ঘটেছে। আচ্ছা, রমু কি আজও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঐ আয়নাটার দিকে? বিয়ের আগে সে যেমন করে আড়চোখে দেখত নিজেকে? দেখত, দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওঠা আপনার যৌবনকে।

হুগলীতে ওদের বাড়ির পিছনে ছিল পুকুর। একটু বেলায় স্নান করতে যেত ওরা। ও আর উমা। বেলা দশটার মধ্যেই পুরুষদের স্নান শেষ হত। পাড়ার এটি এজমালি পুকুর। পাড়ার অধিকাংশই ডেলি প্যাসেঞ্জার। সবাই সকাল সাতটা আটটার মধ্যে দুটি নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতো লোকাল ট্রেনের উদ্দেশ্যে। আনন্দও দশটার মধ্যে আহারাদি সেরে নিয়ে ছুটতো কলেজে। তারপর ওরা দুটি ননদ ভাইবৌ যেত পুকুরঘাটে। শমু সাঁতার জানে না। কলকাতার মানুষ। ঘাটেই টুপ টুপ করে ডুব দিত. আর হাঁক পাড়ত, এই উমা অত জলে যাসনি!

উমা ভ্রূক্ষেপও করত না। চিৎ সাঁতারে ভেসে যেত মাঝপুকুরে। ছোট্ট পুকুর, কিন্তু কী পরিষ্কার জল। ছোট ছোট মৌরলা মাছ এসে ঠোকর মারত গায়ে। প্রথম প্রথম ভারি ভয় পেত শমু। উমা খিল খিল করে হেসে উঠত ওর সেই ভয়-তরাসে ভাবখানা দেখে, বলত, ওরা কামড়ায় না বৌদি।

—না, কামড়ায় না। তোদের পোষা মাছ কিনা!

সেই পুকুরটার জন্য আজও মাঝে মাঝে মন কেমন করে শর্মিলার। আর জীবনে সে জলে স্নান করার সুযোগ আসবে না। শর্মিলার বাস উঠেছে আনন্দের সংসার থেকে, তাছাড়া আনন্দের সংসার উঠে গেছে হুগলীর বাসা থেকে। সেই পুকুরটার যেন একটা সত্তা ছিল। তাকে যেন মনের সব কথা খুলে বলা যায়। বলতও শমু। যে কথা কাউকে বলা যায় না, একগলা জলে নেমে সে কথাই পুকুরটাকে বলত সে। এমন কথাও বলেছে, তোমাকে সব

কথা কেন বলে রাখছি জান ? যদি কোন দিন সহ্য করতে না পারি তোমার কোলেই আশ্রয় নেব আমি। গলায় ফাঁস দিতেত পারব না, গায়ে আগুনও দিতে পারব না। তার চেয়ে তোমার এই ঠাণ্ডা জলই ভাল। তাই না ?

দিদি, তোর হল ?

চমকে ওঠে শর্মিলা। আবার এলোপাতাড়ি চিন্তায় কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছিল সে। রমুর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পায়। তাড়াতাড়ি গা হাত মুছে নেয় শুকনো তোয়ালে দিয়ে। ব্রেসিয়ার পরে, শাড়ি পড়ে, ব্লাউজের বোতাম লাগায়! দোর খুলে বেরিয়ে আসে বাইরে।

—কত দেরি করে দিলি বল্‌ত ?

শমু জবাব দেয় না। এগিয়ে যায় ড্রেসিং টেবিলটার দিকে। রমলা বাথরুমে ঢোকে।

পেট্রল পাম্পে গিয়ে যে বাসটায় উঠে বসল শর্মিলা সেটা এখনও খালি। ছাড়তে দেরি আছে। তার আগে আর একখানা দাঁড়িয়ে। সেটা ভর্তি। তা হোক, ও বসেই যেতে চায়! অনেকটা রাস্তা। টার্মিনাস থেকে ওঠার এইটুকুই তো সুবিধা। একটি দুটি করে যাত্রী আসছে। অফিস টাইম। বাস ভর্তি হয়ে যেতে দেরি হয় না। জানলার ধারে লেডিজ সীটে গিয়ে বসে।

বাস ছাড়ল। সেই চেনা রাস্তা। সেই সাড়ি সাড়ি চেনা বাড়ির মিছিল। সেই কন্ডাকটারের হাঁক। যাত্রীদের হাঁকপাঁক। বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে আশ্রমের কথাই মনে পড়ে গেল আবার। জগদানন্দবাবু ক্রমেই যেন বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন, নিজের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে নানান দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন শর্মিলার কাঁধে। সেই এখন ওদের এ প্রতিষ্ঠানের মূল স্তম্ভ। হিসাব-পত্র রাখা, চিঠিপত্র লেখা, সবই সে করে। মাঝে মাঝে ক্লাসও ও নেয়। ও ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে। মিনি মিত্তির। এখন তিনটি ছোট ছোট মেয়েও যে ভর্তি হয়েছে ওদের আশ্রমে। পনেরটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। মেয়ে তিনটিকে নিয়ে মিনি থাকে দ্বিতলে একটি বড় ঘরে। মিনি আবাসিক শিক্ষিকা। তার ইতিহাসটাও করুণ। সমাজে তার ফিরে যাবার উপায় নেই। শর্মিলা ভাবে মিনিও যেন বিকলাঙ্গ। বাইরে থেকে তার কোন অঙ্গহানি লক্ষ্য করা যায়নি ; কিন্তু ওর কি যেন একটা নেই। আর সে কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে। তাই নিজের বাড়িতে আর তার ফিরে যাবার উপায় নেই। এখানে সে শুধু জীবিকা নয় নূতন জীবনও পেয়েছে। মেয়ে তিনটিকে পেয়ে সে বেঁচেছে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যেটি, মিঠু, সেটা আবার শর্মিলার ন্যাওটা। মাতৃহীন মেয়েটার দুটি পা-ই পোলিও হয়ে অকর্মণ্য হয়ে গেছে। ওর বাপ ওকে পৌঁছে দিয়ে গেছে মাস্টার-মশাইয়ের কাছে। হস্টেলে যেমন বাপেরা রেখে আসে মেয়েকে। মিঠু ভারি চাপা, শান্ত মেয়ে। শর্মিলার মধ্যে

সে যেন তার মরা-মাকেই ফিরে পেয়েছে। মিনির সঙ্গে তার তেমন ভাব নেই। শর্মিলাও ভালবেসে ফেলেছে ঐ একফোঁটা বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে। জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, কোঁকড়ানো টাকা-টাকা চুল, ভারি মিষ্টি চেহারাটা। মিঠুর কাছে তার মায়ের একখানি ফটো আছে। মাঝে মাঝে সে লুকিয়ে দেখে সেটা। শর্মিলাকে ফটোখানা দেখিয়েছে সে। ওর মা সুন্দরী ছিলেন। সেই মায়ের মুখখানাই পেয়েছে মিঠু। বছর আষ্টেক বয়স, পা দুটি যাওয়ার পর যেন বুদ্ধিটা আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। সব বোঝে। পড়ায় লেখায়, অঙ্কে সিদ্ধহস্ত। মাস্টার-মশাই বলেন, একটি অঙ্গ খোয়া গেলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ভগবান এক হাতে নিয়ে আর এক হাতে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেন। যার পা নেই, তার হাত দুটি বেশী শক্তিশালী হয়, যে অন্ধ তার ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি হয় প্রখরতর। বলেন, ঐ যে মার্কিন ছেলেটি মুখ দিয়ে তুলি ধরে অপূর্ব ছবি এঁকেছে, হয়তো সে তা পারত না যদি তার ডান হাতখানি অক্ষত থাকত। এ থিয়োরিটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারে না শর্মিলা। প্রথম কথা, ঈশ্বর করুণাময়, তিনি এক হাতে নিয়ে আর এক হাতে ফিরিয়ে দেন এই হাইপথেসিস্‌টাই হাস্যকর মনে হয়। ঈশ্বর যদি করুণাময় তাহলে মিঠুয়ার পা-দুটি ধরে টান দিতে গেলেন কেন? কিন্তু এ কথা সত্য যে, মিঠুয়ার চলৎশক্তি যতটা গেছে বোধশক্তি ততটা বেড়েছে। বাড়িতে কেন যে তার ঠাঁই হল না তাও বোঝে। এমনকি বাপের অসহায়ত্বকে সে করুণা করতে শুরু করেছে ইদানীং—ঐ একফোঁটা মেয়েটা।

শর্মিলাকে অনেক কথা বলেছে মিঠুয়া। শর্মিলা তার মা-মণি। তার সখী, বান্ধবী। মিঠুয়ার বাপ মিস্টার নাগের বড়-বাজারে বিরাট ব্যবসা। গত যুদ্ধে লোহার কারবারে প্রচুর রোজগার করেছেন তার ঠাকুর্দা। মিস্টার নাগ সেই কারবারের একমাত্র মালিক। আর মিঠুয়া তাঁর একমাত্র মেয়ে। অথচ সব থাকতেও মিঠুয়া আজ নিঃস্ব। নাগমশায়ের অতবড় প্রাসাদোপম বাড়িতে ঐটুকু মিঠুয়ার ঠাঁই হল না। তাকে চিরদিনের মতো চলে আসতে হয়েছে এই আশ্রমে। ওর বাপ মাঝে মাঝে আসে মেয়েকে দেখতে। মিঠু তার চাকা-গাড়ি চালিয়ে সে হাজির হয়। বাপ ওকে আদরে-আদরে মাতিয়ে তোলে। চুপ করে সে অত্যাচার সহ্য করে যায় মিঠু। কিছু বলে না। বড় বড় প্যাকেট খুলে বাপ বার করে দেয় খেলনা, লজেন্স, পুতুল। মিঠু শুধু হাত পেতে নেয় তাই নয়, সে যে খুশী হয়েছে তাও অভিনয় করে দেখায়। তারপর বাবা চলে গেলে সেগুলো দিয়ে দেয় নন্দা অথবা শিখাকে। শর্মিলা বলে—সবগুলো দিয়ে দিলি যে?

ঠোঁট উল্টে মিঠুয়া বলে—ওসব আমার চাই না। ভাল লাগে না।

—চাই না তো নিলি কেন হাত পেতে?

—না নিলে বাপি শুধু শুধু দুঃখ পেত যে !

শর্মিলা অবাক হয়ে যায়। অবাক হওয়ার কারণ আছে যে। মিঠুয়ার যে বয়স তাতে পুতুলের প্রতি মোহ থাকাটাই স্বাভাবিক। শর্মিলা তাকে যে পুতুলটা এনে দিয়েছে, নন্দবাবু যে রান্নাবাড়ির সেট-টা তাকে দিয়েছেন সেগুলি নিয়ে মিঠুয়া আপন মনে খেলা করে আজও। স্কুলের আলমারিতে কিছু কিছু খেলনা কেনা হয়েছে। সেগুলির প্রতি মিঠুয়ার তীব্র আসক্তি আছে। মাঝে মাঝে সেগুলি তাকে বার করে দেওয়া হয়। সেদিন মিঠুয়ার সংসারে ভারি হৈ চৈ পড়ে যায়। সে রান্না করে, পুতুলকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। নন্দা, শিখা, মিনি আর শর্মিলাকে নিমন্ত্রণ করে তার খেলাঘরের প্লেটে খাবার বিতরণ করে। অথচ মিস্টার নাগের পুতুলগুলো নিয়ে সে কোনদিন খেলা করতে বসে না। শর্মিলা সেগুলিকেও সাজিয়ে রাখে পুতুলের আলমারিতে। এমনকি পাঁচসাত দশদিন বাদেও যদি আলমারি থেকে সে পুতুল বার করে দেয়, মিঠুয়া বলে—না, ওগুলো নয়, তুমি ঐ চীনে পুতুলটা দাও বরং।

শর্মিলা চাইল্ড সাইকলজির বই ঘেঁটেছে, মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছে। এখন সে বুঝতে পারে ব্যাপারটা। বাপের প্রতি তার মনোভাব দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। বাপকে সে করুণা করে, বাপকে সে ঘৃণা করে। মিস্টার নাগের দুটি সত্তা সে দেখতে পেয়েছে। একটা তার মায়ের স্বামীরূপে, একটা তার বিমাতার স্বামী হিসাবে। ওর মায়ের মৃত্যুর পর যে বাপ ওর মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল, ওর সেই অতীত বাপকে সে আজও করুণা করে, তার স্নেহের অত্যাচার সে সহ্য করে, তার এনে দেওয়া খেলনা হাত পেতে নেয়, মুখে ফুটিয়ে তোলে খুশীর আমেজ। কিন্তু ওর বর্তমান-বাপকে সে ঘৃণা করে। তার দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে খেলতে বসে না। স্পর্শ মাত্র করে না আর।

মাস্টার-মশায়ের দেওয়া এ ব্যাখ্যাটাও মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল শর্মিলার। এতটুকু মেয়ের মধ্যে অমন দ্বৈতসত্তা থাকতে পারে? মিঠুয়ার মাসির কাছে গল্প শুনে মনে হয়েছিল হয়তো তাও সম্ভব। মিঠুয়ার মাসি প্রায়ই আসেন। শর্মিলাকে তিনি বলেছিলেন ওর পূর্ব ইতিহাস। মাসিকে মিঠুয়া ভারী ভালবাসে। বোধ হয় তাঁর মধ্যে হারানো মায়ের মুখের কিছুটা আদল পায়। মাসির আদরে পায় মায়ের সোহাগের ছোঁওয়া। সেই ভদ্রমহিলাই গল্প করেছিলেন, ওর বাপের ভীষণ ভয় ছিল মিঠুয়াকে। দ্বিতীয়বার যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এই সত্য কথাটা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারেননি একফোঁটা ঐ বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে। এদিকে সব ঠিকঠাক; অথচ মিঠুয়াকে কেমন ভাবে খবরটা জানানো যায় ভেবে উঠতে পারেন না। মিঠুয়া যখন মাতৃহীন হয় তখন তার বয়স বছর-চারেক। তারপরে সে অসুখে পড়ে। এবং তারপরই

সে পঙ্গু হয়ে যায়। বিকলাঙ্গ মেয়েটিকে কেমন ভাবে মানুষ করবেন ভেবে উঠতে পারেন না। আত্মীয় পরিজনেরা ব্যবস্থা দিলেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে। প্রথমটায় তাঁর মত ছিল না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তাঁর। দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। অন্তত মিঠুয়ার মাসি সে জন্য তাঁকে দোষ দেন না। দোষ দেন তাঁর নির্বাচনের। যে মেয়েটির প্রেমে পড়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন সে প্রথমেই শর্ত আরোপ করল মিঠুয়ার ঝামেলা সে ভোগ করতে রাজী নয়। ফলে যে জন্যে বিবাহ করতে যাওয়া সেই উদ্দেশ্যটাই প্রথমে ব্যর্থ হল। অথচ মনের লাগাম তখন ছিঁড়ে গেছে মিঠুয়ার বাপের। শেষকালে নাগমশাই মাসির শরণ নিলেন। মাসি বলেছিলেন, দেখুন, বিয়েটা যখন মিঠুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে না তখন তাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান। আমার কাছে সে থাকুক আপাতত। তারপর সুযোগমতো একদিন তাকে সব কথা খুলে বললেই হবে।

ভদ্রমহিলা বলেন, বুঝলেন দিদি, আমার ভগিনীপতি আর দ্বিরুক্তি করেননি। মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন আমার বাসায়। আমরা কেউই মিঠুকে কিছু বলিনি। কেন যে সে হঠাৎ এ বাড়িতে এল তা তাকে বুঝতে দেওয়া হয়নি। আমার ছেলে মেয়ে, বাড়ির ঝি-চাকরদের বলে দিয়েছিলুম মিঠুয়ার বাপ যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে এ কথা যেন তাকে কেউ ঘুণাক্ষরেও জানবার সুযোগ না দেয়। ওর বাপও লজ্জায় আমাদের বাড়িতে আসত না। মিঠুয়াকে আমরা নানা ভাবে ভুলিয়ে রাখি আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে থাকে, খেলা করে। ও চিরকালই শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। তাই ওর কোন ভাবান্তর হয়ে থাকলেও তা আমাদের কারও নজরে পড়েনি। আশ্চর্য, ও কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার নামও করে না। বাপের কথাও জিজ্ঞাসা করে না একেবারে। শেষে একদিন স্থির করলাম ওকে ব্যাপারটার ইঙ্গিত দিতে হবে। একটু একটু করে কয়েকদিনের মধ্যে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে কত বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে ওর জীবনে। সাত আট বছরের মেয়ে সবটা বুঝতে পারবে না, তবু তাকে বুঝবার সুযোগ দেওয়া উচিত যে, এতদিনের আবাসের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাই মাসখানেক পরে একদিন নিজে থেকেই বললাম, হ্যাঁরে মিঠু, তোর বাবার জন্য মন কেমন করে না?

ও চুপ করে রইল।

বলি, তোর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না?

বললে, ইচ্ছে করলেই বা সেখানে আমাকে যেতে দেবে কেন?

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন রে? যেতে দেবে না কেন?

এর জবাবে ও কী বললে জানেন? বললে, বাপি তো আবার বিয়ে করেছে।

আমাকে সেখানে ঢুকতেই দেবে না।

আমি তো অবাক! বুঝুন কাণ্ড। মাত্র সাড়ে-সাত বছরের মেয়ে। কেমন করে আন্দাজ করল সে? আড়াল থেকে আমাদের কোন কথাবার্তা শুনেছে, না একটা অঙ্গ খুঁতো হওয়ায় ওর কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠেছে? তা সে যাই হোক, সব জেনেও সব বুঝেও সে তো একেবারে চুপচাপ ছিল। কাঁদেনি কোনদিন। রাগ করেনি, অভিমান করেনি। এমন অনাসক্তভাবে কেমন করে সে গ্রহণ করল এতবড় দুঃসংবাদটাকে?

বলি, তুই কেমন করে জানলি?

মুখটা নিচু করে বলে, আমি জানি।

—বিয়ে করেছে তো কি হয়েছে? তাই বলে তুই বাড়ি যাবি না?

বেণী ঝাঁকিয়ে মিঠুয়া শুধু বললে, না।

বললুম, কেন রে?

ও জবাব দিল না। মুখটা নিচু করে বসেই রইল তার চেয়ারে। বড় বড় জলের ফোঁটা এতক্ষণে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল ওর আনত গাল বেয়ে।

হু-হু করে উঠল বুকের মধ্যে। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলি, দূরে বোকা মেয়ে। কাঁদে নাকি। নতুন মা তোকে কত ভালবাসবে। কত খেলনা কিনে দেবে, পুতুল কিনে দেবে, আদর করবে—

ও শুধু মুখটা নিচু করে বলে, না।

—না কেন? তুই মেয়ে, তোকে ভালবাসবে না?

—না।

—না কেন রে?

এতক্ষণে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মিঠুয়া। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে, আমি যে খোঁড়া!

শর্মিলা প্রশ্ন করেছিল—ওর নতুন মা ওকে নিয়ে যায়নি একবারও?

মাসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—না।

—এমনকি মেয়েকে দেখতে আপনাদের বাড়িতেও আসেনি?

মিঠুয়ার মাসি হেসে বলেছিলেন—কই আর এল বলুন! মিঠুয়া আজও দেখেনি তার বিমাতাকে। আমাদের বাড়ি থেকেই তো সে এখানে চলে আসে।

—মিস্টার নাগ ওকে নিয়ে যেতে চেষ্টাই করেননি?

—চেষ্টা করেছিলেন, মিঠুয়া যায়নি। এদিকে দেখতে খুব শান্ত সরল, কিন্তু আসলে ভারি জেদী আর একগুঁয়ে। ওর বাপকে খবর দিয়েছিলাম, জানিয়েছিলাম, মিঠুয়া সব কথা জানতে পেরেছে। ভদ্রলোক ছুটে এসেছিলেন খবর পেয়ে, একগাদা দামী দামী খেলনা পুতুল নিয়ে। কিন্তু কি যে হল মেয়ের।

বাপ এসেছে খবর পেয়েই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল বাথরুমে। দরজার নিচের দিকে একটা ছিটকিনি করিয়েছিলাম ওর জন্যে। সেটা বন্ধ করে বসে রইল একটি বেলা। বাড়িসুদ্ধ কেউ বাথরুমে যেতে পারে না। ঘণ্টা-তিনেক অপেক্ষা করে মুখ কালো করে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন, তখন দরজা খুলে দিল মেয়ে। আমরা কত বোঝালাম, বোবা জন্তুর মতো ও মুখ বুঁজে চুপ করে রইল। একটা কথাও বলল না, একফোঁটা জল পড়ল না ওর চোখ দিয়ে। ভাবলাম এতক্ষণে বোধ হয় রাগটা পড়েছে। একটা প্রকাণ্ড ডল-পুতুল ওর কোলে দিতেই মট করে তার মুণ্ডু ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আজও শর্মিলার ভয় হচ্ছে তাই। সে ওদের স্কুল ছেড়ে চলে যাবে শুনে মিঠুয়া কি আবার বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে? সেই নাটকটার পুনরভিনয় হবে আবার? মিঠুয়া কি আর কথা বলবে না তার মা-মণির সঙ্গে? দুরন্ত অভিমানী মেয়েটাকেই আজ সবচেয়ে ভয় হচ্ছে শর্মিলার।

মিস্টার নাগ অবশ্য এখন প্রায়ই আসেন। শর্মিলা একদিন বাধ্য হয়ে বলেছিল—দেখুন মিস্টার নাগ, কথাটা হয়তো ভাল লাগবে না আপনার, তবু প্রতিষ্ঠানের মুখ চেয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে, এতসব খেলনা পুতুল আপনি রোজ রোজ নিয়ে আসবেন না।

মিস্টার নাগ অবাক হয়ে বলেছিলেন—কেন বলুন তো?

একটু কঠিন হয়ে শর্মিলা সেদিন বলেছিল এখানে সবাই তো বড়লোকের মেয়ে নয়। আমরা ওদের একভাবে মানুষ করতে চাইছি। আপনার এসব উপহার তার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

মিস্টার নাগ একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন—আপনাদের তো মাত্র তিনটি মেয়ে আছে। আমি যদি এর পর থেকে ওদের তিনজনের জন্যেই উপহার নিয়ে আসি?

শর্মিলা বলে—কী দরকার? এদের জন্য যদি সত্যিই আপনি টাকা খরচ করতে চান তাহলে আমাদের ডোনেশান দিন না। চাঁদার খাতা তো আমরা বাড়িয়েই আছি। আর শুধু যদি মেয়েকে ভালবাসা দেখাতে চান তাহলে তাকে বাড়ি নিয়ে যান।

অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারেননি নাগমশাই। তারপর বলেন—সব কথা তো আপনাকে বলা যায় না। সম্ভব হলে মেয়েকে নিয়েই যেতুম কিন্তু—

শর্মিলা একটু নরম হয়ে বলেছিল—জানি। আপনি না বললেও আপনার পারিবারিক সমস্যাটা কিছু কিছু শুনেছি আমি। কিছুটা আপনার মেয়ের কাছে কিছুটা তার মাসির কাছ থেকে।

ভদ্রলোক হঠাৎ বলে ওঠেন—আচ্ছা, আমি যদি ওকে মাস-কয়েকের জন্য আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই, আপনারা ছেড়ে দেবেন?

—মাস কতকের জন্য ? ওর নতুন মা—

কথাটা সে শেষ করতে পারেনি। সঙ্কোচে থেমে গিয়েছিল। ভদ্রলোক মাথাটা নিচু করে বলেন—তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন। মাস তিনচার সেখানেই থাকবেন।

ইতস্তত না করে শর্মিলা প্রশ্ন করেছিল—ইস শী ইন এ ফ্যামিলি ওয়ে ?

ভদ্রলোক স্বীকার করে বলেছিলেন—সুতরাং মাস তিনচারের জন্য মিঠুয়াকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই মানে যতদিন না ওর মা—

শর্মিলা বাধা দিয়ে বলেছিল, তা হয় না। দেখুন মিস্টার নাগ, অপ্রিয় হলেও কথাটা আমাকে বলতে হচ্ছে। ট্রান্সপ্লান্টেশনে গাছ বাঁচে, কিন্তু টানা-ছেঁড়ায় বাঁচে না। ওকে এত শৈশবে আমরা তুলে এনে এখানে রোপন করেছি যে, আমাদের আশা আছে এখানেই একদিন ফুলে ফলে ও বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বারে বারে এ টানাপোড়েন তো ও সহ্য করতে পারবে না। যে পরিবেশে ওর কোনদিনই স্থান হবে না সে পরিবেশটা ওর স্মৃতি থেকে মুছে যেতে দিন। শুনতে খুবই খারাপ লাগবে আপনার, কিন্তু আপনার দেওয়া খেলনাগুলো ও স্পর্শ মাত্র করে না। নেহাৎ আপনি আঘাত পাবেন, তাই সেগুলি হাত পেতে নেয়।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকেন মিঃ নাগ। বলেন—আমাকে সে খুব ঘৃণা করে, নয় ?

শর্মিলা বলে—ও শিশু। মাত্র সাত-আট বছরেই কতগুলো আঘাত সে পেয়েছে মনে করে দেখুন। দৈহিক আর মানসিক। ওকে আপনি মুক্তি দিন।

ভদ্রলোক চশমাটা খুলে ফেললেন। রুমালে চোখটা মুছে নিয়ে বলেন—বাপ হয়ে এ যে কত বড় শাস্তি তা আপনি বুঝবেন না।

শর্মিলা চুপ করে থাকে।

একটু সামলে নিয়ে ভদ্রলোক আবার বলেন—আচ্ছা, এখনি আপনি বলছিলেন, মিঠুয়া এখানে ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। কতদূর আশা করেন আপনারা ? কী হবে ওর ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল শর্মিলা—এখনই তা অবশ্য বলা খুব কঠিন। প্রথমত এ জাতীয় কাজ এ দেশে আগে বিশেষ কিছু হয়নি। আমাদের এটা এ অঞ্চলে পায়োনিয়ার কাজ বলতে পারেন। ফলে আমরা কত দূর সাফল্য লাভ করব তা বলা দুষ্কর। দ্বিতীয়ত এখন ওকে আমরা সাধারণ লেখাপড়া শেখাচ্ছি। ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য। একটু বড় হলে ওকে আমরা কারিগরী শিক্ষা দেব। শেলাই শিখতে পারে, কাটিঙের কাজ, উইভিং-নিটিং, চামড়ার কাজ—কত কি শিখতে পারে। মোট কথা, একটা

পেট চালাবার মতো কারিগরী শিক্ষা তাকে আমরা দিয়ে দেব।

মিস্টার নাগ তার জবাবে বলেছিলেন—কিন্তু তাতে কী লাভ? ওর একটা পেট চালাবার মতো ব্যবস্থা তো আমিই করে যাব। এসব না শিখলেও যাতে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পারে সে ব্যবস্থা কি আমিই করব না? যতই কেন না ভুলে যেতে বলুন আমাকে—এ কথা তো ভুলে যেতে পারব না যে, আমি ওর বাপ!

শর্মিলা আহত হয়ে বলে—আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না। আমি এদের নিয়ে আছি তাই এদের মনের কথাটা আমি যে ভাবে জেনেছি সেভাবে জানবার সুযোগ আপনার হবে না। এদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আত্মনির্ভর হতে পারা। অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা। তা না হলে এদের মনে একটা ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স থেকে যাবেই—এবং সেজন্য এরা কিছুতেই মানসিক শান্তি পাবে না বিকলাঙ্গ একটি মানুষ কিছুতেই শান্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে সে কারও করুণার ভিখারী নয়।

—বেশ তো, ওকে উপার্জনক্ষম করে মানুষ করতে চান করুন তাতে আমি আপত্তি করব কেন। কিন্তু তা হলেই কি জীবনে সব কিছু পাওয়া হয়? আপনি কি মনে করেন, ও কোনদিন ঘর পাবে, বর পাবে?

শর্মিলা বলেছিল—ঘর বর পাবে কিনা জানি না, কিন্তু সন্তান যে পাবে না তা আপনিও জানেন, আমিও জানি।

—তবে? তা সত্ত্বেও আপনি আশা করেন ওর বিয়ে হবে একদিন?

—কেন আশা করব না? হয়তো আমাদের স্কুলের কোন ছেলেই বিয়ে করবে ওকে। ও কোনদিন তার সন্তানের জননী হবে না একথা জেনেও—

—এ আপনার আকাশ-কুসুম কল্পনা।

—মোটেই নয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানে এমন ছেলে আছে, যে শারীরিক কারণে কোন সুস্থ সবল মেয়েকে বিয়ে করলেও সন্তানের জনক হতে পারবে না কোনদিন। তেমন ছেলের হয়তো ঐ একই কারণে বিয়ে হবে না। কেন আমরা আশা করতে পারব না মিস্টার নাগ, যে সে রকম একটি ছেলে মিঠুয়াকে ভালবেসে জীবনসঙ্গিনী করবে না? দুটি অঙ্গহীন নরনারীর পক্ষে একটি সুখের সংসার গড়ে তোলা এমনকি আকাশকুসুম? এমনকি হয়তো দেখবেন তারা দত্তক নেবে কোন পিতৃমাতৃহীন অনাথাকে। হয়তো কোন বিকলাঙ্গকেই! সন্তানের অভাবও ভুলবে ওরা।

ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন—আপনার এ স্বপ্ন সার্থক হোক। সেদিন কোন খেদ থাকবে না আমার।

একটু থেমে আবার বলেন—সেই ভাল। তাই হোক। সুস্থ সবল কোন ছেলের সঙ্গে ওর জীবন যুক্ত না হলেই ভাল। দুটি অপূর্ণ মানুষ পূর্ণ করে

তুলুক একটা সুখের সংসার।

শর্মিলা জবাবে বলেছিল—তাই বা কেন? হয়তো কোন সুস্থ সবল ছেলেই বিয়ে করবে ওকে, সব জেনেশুনে। ভালবাসায় কি না সম্ভব?

মিস্টার নাগ প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন—তা হয় না। পূর্ণাঙ্গ কোন মানুষ কখনও বিকলাঙ্গ কোন মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে পারে না।

শর্মিলা এবারও প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। মনীশবাবু গত সপ্তাহে এমনই একটি ঘটনার কথা সবিস্তারে লিখেছেন মাস্টার-মশাইকে। আর মাস্টার-মশাই তা জনে জনে দেখিয়েছেন বিশ্বযুদ্ধে আহত একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে ওদেশের একজন ধনকুবেরের কন্যা। ডেভিড ছিল পাইলট; দুর্ঘটনায় দুটি পা-ই কাটা যায় তার। বিমানবহরে ছেলেটি ছিল নামকরা পাইলট; তার বীরত্বের কথা শুনে, তার সঙ্গে আলাপ করে মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে যায়। ছেলেটি ওখানকার একটি বিকলাঙ্গদের স্কুলে শিক্ষকতা করত। মেয়েটি তাকেই ভালবেসে বিয়ে করেছে।

সেই কথাই বলতে যাচ্ছিল শর্মিলা। থেমে পড়ল ভদ্রলোকের কথায়—সে হয় না মিসেস মিত্র।

মিসেস মিত্র! তাই তো! এই তো ওর পরিচয়। আর যে বলে বলুক ও গল্প মিসেস শর্মিলা মিত্র বলতে যাবে কোন্ অধিকারে? অন্তত যতদিন ওর পরিচয় হচ্ছে 'মিসেস মিত্র'!

কন্ডাকটার এসে দাঁড়ায় ওর সামনে।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে খুচরো পয়সা বার করে শর্মিলা। টিকিট দিয়ে কন্ডাকটার এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুব দেয়। সে মন স্থির করে ফেলে। আর দেরী করা উচিত হবে না। জগদানন্দবাবুকে আজই সব কথা খুলে বলতে হবে। সব কথা না বললেও কিছুটা বলা দরকার। তাঁকেও তো খানিকটা সময় দেওয়া উচিত। ক্রমে ক্রমে স্কুলের যাবতীয় দায়িত্বই যে শর্মিলার স্কন্ধে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন মাস্টার-মশাই। শর্মিলার অবর্তমানে কী ব্যবস্থা করবেন তা তাঁকে স্থির করবার সুযোগ দেওয়া দরকার। মাস্টার-মশাই বেশ অথর্ব হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে। নিশ্চয় মুষড়ে পড়বেন তিনি, খবরটা পেয়ে। তবু দেরী করে লাভ নেই। অনিবার্য আঘাত থেকে তাঁকে যখন বাঁচানো যাবে না তখন অপ্রিয় কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব সেরে ফেলাই ভাল। বিকাশ আজই সন্ধ্যায় আসছে। আজ হোক, দুদিন পরে হোক বিকাশের সংসারে শর্মিলাকে চলে যেতে হবে।

কিন্তু ভয় তো জগদানন্দবাবুকে নয়, ভয় তার মিঠুয়াকে। জগদানন্দবাবু মর্মাহত হবেন, মুশড়ে পড়বেন মনে মনে, তবু মুখে তা স্বীকার করতে পারবেন

না। মৌখিক সৌজন্যটুকু তাঁকে বজায় রাখতে হবে, আশীর্বাদ করতে হবে হাসি মুখে। কিন্তু মিঠুয়া? সে লৌকিকতার ধার ধারে না, সামাজিকতার বালাই তার নেই। আদিম প্রবৃত্তির বশে সে চলে। অন্ধ আবেগে শিশুমনের প্রতিক্রিয়া কী রূপ নেবে কে জানে! হয়তো দোর দিয়ে বসে থাকবে। কথাই বলবে না তার মা-মণির সঙ্গে। সেবার যেমন করেছিল তার বাপের সঙ্গে। দুরন্ত অভিমানী মেয়েটাকেই আজ সবচেয়ে ভয় হচ্ছে তার।

মাস্টার-মশাই বসেছিলেন নিচের অফিস ঘরেই। ওকে দেখে বলে ওঠেন —এই তো তুমি আজ এসে গেছ। বাঁচলাম। আমি ভেবেছিলাম আজ বুঝি তুমি আসতে পারবে না।

শর্মিলা ম্লান হাসে। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে রেজিস্টার খাতাখানা তুলে নেয়। বৃদ্ধ বলেন—ওসব খাতাপত্র রাখ। শোন, জরুরী খবর আছে। আজ বিকালে একবার রাইটার্স বিল্ডিংসে যেতে হবে আমাকে। গভর্নমেন্ট বোধ হয় আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারেন। যোগীন্দ্রনাথবাবু জানিয়েছেন, বিকালবেলা এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

শর্মিলা মরিয়া হয়ে বলে ফেলে—কিন্তু আজ বিকালে আমার যে একটা জরুরী কাজ আছে স্যার।

—কাজ আছে? সেটা কাল হয় না?

—না স্যার। একজন আসবেন দিল্লী থেকে। তাঁকে রিসিভ করতে দমদমে যেতে হবে।

—ও। আচ্ছা তবে থাক। আমি একাই যাব না হয়।

শর্মিলা ভাবে এই কি সুযোগ? এখনই কি বলে ফেলবে কথাটা? যাকে আনতে যাচ্ছে দমদমের বিমানঘাঁটিতে সেই ওর ভাবী স্বামী! কিছুদিনের মধ্যেই তার দিল্লীর সংসারে শর্মিলাকে চলে যেতে হবে। বলতে গিয়েও মুখে বেধে যায়। যদিও এর মধ্যে একদিনের জন্যেও জগদানন্দবাবু তাঁর ছাত্রের নাম মুখে আনেননি তবু শর্মিলা অনুভব করতে পারে বৃদ্ধ মনে মনে আশা পোষণ করেন যে, শমু একদিন আবার তার অন্ধ স্বামীর কাছে ফিরে যাবে। আচ্ছা, আনন্দ যে অন্ধ হয়ে গেছে এ খবর কি মাস্টার-মশাই জানেন? বোধ হয় না। কেমন করে জানবেন? সেই প্রথম দিনের পর থেকেই তিনি তাঁর ছাত্রের কথা শর্মিলার সঙ্গে আর কোনদিন আলোচনা করেননি। আনন্দ এমনিতেই চিঠিপত্র বড় একটা কাউকে লিখত না। এখন তো তার লিখবার ক্ষমতাই নেই। ফলে জগদানন্দবাবুর পক্ষে এ সংবাদ জানবার কথা নয়।

শর্মিলা কিছু বলার আগেই জগদানন্দবাবু অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। বলেন —কাল তুমি আসনি, আমি সারাদিন একটা বড় ইন্টারেস্টিং বই পড়েছি শমু।

একজন আমেরিকান ডাক্তারের আত্মজীবনী। আত্মজীবনী অবশ্য ঠিক বলা চলে না তাকে। ভদ্রলোক পঞ্চাশ বছর সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন। নামকরা সার্জেন একজন। সম্প্রতি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। বিভিন্ন সময়ের কতকগুলি কেস হিস্ট্রি। ভারি সুন্দর লেখা। পড়ে দেখ তুমি।

হাত বাড়িয়ে বইটি শর্মিলা গ্রহণ করে।

ভিতর বাড়িতে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল অঞ্জনের সঙ্গে। কিশোর ছেলেটির ডান পা-টা হাঁটু থেকে কাটা। ক্রাচে ভর দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছিল। বললে—মা-মণি, কালকে আসেননি কেন? কাল আপনার জরিমানা হয়ে গেছে।

শর্মিলা হেসে বলে—বেশ, জরিমানাই দেব। কত জরিমানা?

—তাহলে আমাদের স্টুডিওতে চলুন, সেখানে আপনার বিচার হবে।

শর্মিলা বলে—এ ব্যবস্থাটা ভাল। জরিমানাটা হয়ে গেছে কালকে আর আজকে হবে বিচার! বেশ চল।

অঞ্জনের পিছু পিছু শর্মিলা স্টুডিও ঘরে ঢোকে। বেশ বড় 'হল-কামরা' একটা। ছেলেরা এখানে হাতের কাজ শেখে। কেউ মডেলিং করে, কেউ ছবি আঁকে, কেউ বা বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ শেখে। ও পাশে আর একটি ছোট ঘর। হ্যান্ড-প্রেস আছে সে ঘরে। ছাপাখানার কাজ হয়। তার লাগাও বুক বাইন্ডিং সেকশান। নন্দবাবু ছেলেদের কাজ শেখাচ্ছিলেন। হাত তুলে নমস্কার করেন শর্মিলাকে।

অঞ্জন বলে—মা-মণিকে ধরে এনেছি স্যার। কাল উনি ক্লাস পালিয়েছিলেন। আজ তাই ওঁর শাস্তি হবে।

নন্দবাবু হেসে বলেন—ব্যাপার মন্দ নয়, আজকাল কি ছাত্ররাই শিক্ষককে শাস্তি দিচ্ছে নাকি?

অঞ্জন বলে—অন্যায় করলেই জরিমানা দিতে হয় স্যার।

শর্মিলা বলে—বেশ তো, জরিমানাটা কত, আগে শুনি।

বোধ হয় আগে থেকেই শেখানো ছিল। অঞ্জনের ইঙ্গিতমাত্রে সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে—ওঁর জরিমানা এক গল্প।

—এক গল্প! মানে?

—মানে ক্লাস হয়ে গেলে আমাদের একটা জমাটি ভূতের গল্প শোনাতে হবে।

শর্মিলা বলে—এই কথা? বেশ, জরিমানা দেব আমি। কিন্তু এখন আমাকে ছেড়ে দাও। মিঠু-মার কাছে যাই এবার। দেখি, তিনি আবার কী জরিমানা করে বসে আছেন।

ছেলেরা পথ ছেড়ে দেয়। শর্মিলা পায়ে পায়ে দ্বিতলে উঠে আসে। মনীশবাবু সৌখিন লোক ছিলেন মনে হয়। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ শ্বেতপাথরের টেবিল, তার উপর পিতলের ভাস। ক্যাকটাস লাগানো আছে তাতে। দেওয়ালে সারি সারি ছবি। প্রাকৃতিক দৃশ্য। ল্যান্ড স্কেপ। সমস্ত ঝক্‌ঝক্ তকতক করছে! ছেলেরা সেদিক থেকে শান্ত বলতে হবে। ছবির কাঁচ ভাঙেনি, দেওয়ালে হিজিবিজি কাটেনি।

মিনির আস্তানা দ্বিতলে। মন্টুর জন্য দোতলার সব চৌকাঠ কেটে ফেলা হয়েছিল। যাতে সমস্ত দ্বিতলটাতেই সে তার চাকাগাড়িতে ঘুরতে পারে। মিঠুয়ারও নিম্নাঙ্গ একেবারে অবশ। সে দাঁড়াতে পারে না। চাকাগাড়িতে সেও ঘোরে সারাটা দোতলায়।

মানদা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল। হঠাৎ থেমে পড়ে বলে—ছোড়দি ভীষণ রাগ করেছে। কাল রাতে কিছুতেই খাওয়ানো যায়নি তাকে। যান, রাগ ভাঙান গিয়ে।

ছোড়দি অর্থে মিঠুয়া।

—মিনি কোথায় রে?

—এই তো বেরুলেন।

সামনের ঘরেই শিখা আর নন্দা পড়তে বসেছে। টাস্ক দিয়ে মিনি বেরিয়ে গেছে কোথায়। ওকে দেখে নন্দা হাত তুলে নমস্কার করল। শিখার দুহাত তুলবার উপায় নেই—এক হাতেই সেলাম করে সে।

—মিঠুদিদি কই রে?

শিখা চোখের ইঙ্গিতে দেখায়। মিঠুয়া খাটে শুয়ে আছে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে। শর্মিলা আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ওর শিয়রের দিকে। মিঠুয়া টের পেয়েছে নিশ্চয়। সাড়া দেয় না। মড়ার মতো পড়ে থাকে।

—কাল রাতে মিঠুদিদি নাকি খায়নি? কেন? রাগ হয়েছে?

মিঠুয়া কোন সাড়া দেয় না।

শর্মিলা জোর করে ওকে এদিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মিঠুয়া। সে কী কান্না! ফুলে ফুলে কাঁদছে সে বালিশে মুখ গুঁজে। শর্মিলা একটু অবাক হয়ে যায়। ব্যাপার কি? এর আগেও তো সে কামাই করেছে। এতটা বাড়াবাড়ি তো করেনি কখনও মিঠুয়া! ওকে আদর করে, বুঝিয়ে কত রকমে শান্ত করতে যায়। কিন্তু একগুঁয়ে জেদী মেয়েটা কিছুতেই এদিকে ফেরে না, কথা বলে না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই শর্মিলা উঠে পড়ে। থাক, একটু সময় যাক। তারপর আপনিই রাগ পড়বে। উঠে এসে বসে শিখা আর নন্দার কাছে।

—মিনিদি কি পড়া দিয়ে গেছেন দেখি?

ওরা পড়া দেখায়।

—আমি যে টাস্ক দিয়েছিলাম, তা হয়েছে ?

হ্যাঁ, তাও করে রেখেছে ওরা। দেখায় সে সব। শর্মিলা ভুল সংশোধন করে দেয়। বলে—আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিচের ছেলেরা গল্প শুনতে আসবে—

—জরিমানা তো ? আমরা জানি। বললে নন্দা।

শর্মিলা একটু অবাক হয়ে বলে—তোমরা কেমন করে জানলে ?

—অঞ্জনদা এসে জনে জনে শিখিয়ে দিয়ে গেছে যে।

—ও, তাই বল

ওরা দুজনে পড়া তৈরী করতে থাকে। একগুঁয়ে জেদী মিঠুয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েই থাকে। শর্মিলাও রাগ করে মনে মনে বলে—থাকুক। এত অল্প কারণে এত অভিমান হলে সাধাসাধি করতে যাওয়া মূর্খামি। বেশী আদর দেওয়া ঠিক নয়।

শর্মিলা একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। মাস্টার-মশাইয়ের দেওয়া বইটা খুলে পড়তে থাকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বইয়ের মধ্যে ডুবে যায় একেবারে। অজানা পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যায় ক্রমে।

আমেরিকান ডাক্তার ভদ্রলোক ভূমিকায় বলেছেন তিনি যখন এ গ্রন্থটি লিখতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স একাত্তর। সারাজীবনে যত কেশ ঘেঁটেছেন তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর অসংখ্য কেস ডায়েরীতে। তার থেকে বেছে বেছে কয়েকটি ঘটনা তিনি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন ভাবীকালের ডাক্তারদের জন্য। তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে আগামী দিনের চিকিৎসক যেন সেইসব ভুল না করেন যেগুলি তিনি একদিন করেছিলেন। প্রথম দিকেই একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলা আছে ঃ

তিনি তখন মিশিগানের একটি বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। সে তাঁর প্রাথমিক যুগ। বয়সে তরুণ। হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক। ওরই ওয়ার্ডে একটি রোগী এল একদিন। মিসেস স্মিথ। তাঁর স্বামীও এসেছিলেন সঙ্গে। ভদ্রলোক অটোমোবাইল এঞ্জিনিয়ার। মিশিগানের একটি কারখানায় যুক্ত আছেন। দুজনেরই অল্প বয়স। মাত্র বছর-খানেক হল বিয়ে হয়েছে ওঁদের। স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। কারখানার ডাক্তারবাবু রোগিণীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু আশঙ্কা করে মিস্টার স্মিথকে বলেছেন অবিলম্বে বড় হাসপাতালে রোগিণীকে স্থানান্তরিত করতে।

ডাক্তারবাবু মিসেস মার্গারেট স্মিথকে পরীক্ষা করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত হল তাঁর। তাঁর সে পরিবর্তন মিস্টার স্মিথের নজর এড়ায়নি। সাগ্রহে বলেন—কী বুঝছেন ডক্ ?

—আরও চব্বিশ ঘণ্টা আগে আপনি এলেন না কেন ?

· কেন ? বাচ্চা কি বেঁচে নেই ?

—এখনও বেঁচে আছে, তবে প্রসবকাল পর্যন্ত বোধ হয় থাকবে না।

স্মিথ একেবারে মুষড়ে পড়েন। এইটিই ওঁদের প্রথম সন্তান। বলেন—কোন রকমেই কি বাচ্চাকে বাঁচানো যায় না ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু বলেন—কঠিন কেস, তবু চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

—চেষ্টা করবেন ?

—নিশ্চয়। স্বাভাবিক প্রসব সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলে বাচ্চা বাঁচবে না। এখনই ওকে সিজারিয়ান করে বার করে আনব।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে অপারেশন থিয়েটারে পাঠিয়ে দিতে বলেন।

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়াতে চড়াতে ডাক্তারবাবু ফের প্রশ্ন করেন—একটা কথা মিস্টার স্মিথ, যদি দুজনকেই একসঙ্গে বাঁচাতে না পারি—

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মিঃ স্মিথ বলেন—তাহলে শুধু বাচ্চার মাকেই বাঁচাবেন।

ডাক্তারবাবু সায় দিয়ে বলেন—ঠিক কথা। এ আপনাদের প্রথম সন্তান। নেহাৎ যদি না বাঁচে, কী করা যাবে ? তবে আপনার স্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখলাম—তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পরের বার সুস্থ সবল সন্তান না হবার কোন কারণ নেই।

—কিন্তু এবারই বা এমন হল কেন ?

ডাক্তারবাবু অপারেশন থিয়েটারে যাবার জন্য উঠে পড়েছিলেন। বলেন—সে একাডেমিক ডিস্কাশানটা না হয় ফিরে এসে করা যাবে।

—আয়াম সরি ! লজ্জিত হয়েছিলেন স্মিথ সাহেব।

আলোকোজ্জ্বল অপারেশন থিয়েটারে এসে প্রবেশ করেন সার্জেন। রোগীকে তার আগেই তোলা হয়েছে টেবিলে। যন্ত্রপাতির চলমান ট্রেখানা যথাস্থানে নীত। আ-সেপটিক গ্লাভস্‌টা পরতে পরতে ডাক্তারবাবু এগিয়ে আসেন। অ্যানাসথেটিস্ট মিসেস স্মিথের মুখের কাছে সম্মোহনী চোঙাটা ধরবার উপক্রম করতেই রোগিণী বলে ওঠেন—টেল মি ডক, ইস্‌ ইট ডেড ?

ডাক্তারবাবু সে প্রশ্নের জবাব দেননি। প্রয়োজন ছিল না, কারণ জবাব দিলেও তা শুনতে পেতেন না মিসেস স্মিথ। অচেতন ঘুমে ঢলে পড়লেন রোগিণী।

দ্রুতহস্তে অস্ত্রোপচার করে চলেন তিনি। ছুরি তো নয় যেন মীরজাপ, —বীণকার যেন দ্রুতচ্ছন্দ ঝালা বাজাচ্ছেন। আলতো আঙুলে একটার পর একটা অস্ত্র তুলে নিচ্ছেন। আসন্নপ্রসবার উদরদেশে নিপুণ হাতে ছুরিটি বসিয়ে দিলেন। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো, রোজই যেমন রাঙিয়ে দেয়

তাঁকে। একটার পর একটা অস্ত্র যোগান দিয়ে যাচ্ছে সহকারী নার্স। জোরালো আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে গর্ভের অন্ধকার। তারই ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনলেন সেই মাংসপিণ্ডটাকে। দিলেন তুলে নার্সের হাতে। দ্রুতহস্তে আবার সেলাই করে চলেন ক্ষতমুখ। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। অভ্যস্ত ছন্দে কাজ হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত থামল তেহাইএর বোল। সামনে এসে থামলেন সার্জেন। ঘুরে দাঁড়ালেন, একি! নার্স চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কেন শিশুটিকে নিয়ে! হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে গ্রহণ করেই বুঝতে পারেন তার কারণ। এত পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হয়েছে। শিশুটি বেঁচে নেই। স্টিলবর্ন বেব। কন্যাসন্তান। কিন্তু এ আবার কি? শিশুটির বাঁ-পায়ের 'ফিমার বোনটা' নেই। বাঁ-পায়ের হাঁটু কোমরের কাছে গজিয়েছে—জানু বলে কোন কিছু নেই বাম অঙ্গে। ডান পায়ের তুলনায় তাই বাঁ পা-টা অনেক ছোট। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওঁর। এ ভালই হয়েছে যে, এ মেয়ে জীবিত জন্মগ্রহণ করেনি। শিশুটিকে ভাল করে পরীক্ষা করবেন বলে তুলে ধরেন আলোর সামনে। আবার চমকে উঠতে হল তাঁকে। এ কি! শিশুটি তো মৃত নয়, মুমূর্ষু, কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়নি; কিন্তু হৃদ্‌স্পন্দনও বন্ধ হয়নি ওর। মায়ের সঙ্গে রক্তের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে, অথচ স্বাভাবিক শ্বাসকার্য শুরু হয়নি এখনও। ওকে বাঁচাতে হলে এখনই ওর মুখটা খুলে দিতে হবে। বাচ্চাকে কাঁদাতে হবে। অভ্যাসবশত সে কাজ করতে গিয়েই হঠাৎ থেমে পড়েন ডাক্তারবাবু।

কী দরকার? ওর বাপ জানে সন্তান মৃত, মায়েরও তাই আশঙ্কা; নার্স তো ধরেই নিয়েছে বাচ্চা প্রাণহীন! অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যদি তিনি বলেন যে, বাচ্চাকে বাঁচানো গেল না, মা ভালই আছে, তাহলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে স্মিথ। মার্গারেট হয়তো কাঁদবে কিছুদিন; তারপর ভুলে যাবে। সদ্য বিবাহিত একটি রমণী বেশী দিন এ কথা মনে রাখে না। আবার নূতন সন্তান আসবে ওর কোল জুড়ে ভুলিয়ে দেবে না-দেখা প্রথম সন্তান হারানোর দুঃখ। বিশেষ যখন সে জানতে পারবে ওর প্রথম সন্তানটি ছিল বিকলাঙ্গ।

কিন্তু যদি এ মেয়েটি বেঁচে ওঠে! ঐ বিকলাঙ্গ বাচ্চা মেয়েটির অনাগত ভবিষ্যজ্জীবন যেন মুহূর্তের মধ্যে ভেসে উঠল ডাক্তারবাবুর চোখে। ডাক্তারবাবু লিখেছেন—'ওর সমস্ত জীবনটা যেন দেখতে পেলুম এক লহমায়। স্কুলের মেয়েরা ওকে ঠাট্টা করে, ভ্যাংচায় সবাই ছুটোছুটি করে, স্কিপিং করে, খেলে—আর ও চুপচাপ বসে থাকে একা উইলো গাছের তলায়। আরও বড় হয় মিস স্মিথ, বাড়িতে স্যুটার আসে না, ল্যাংড়া মেয়েকে নিয়ে বাপ মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিয়ে হয় না ওর, হওয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো মনের

দুঃখে আত্মহত্যা করে বসে একদিন।

"লিখতে যতক্ষণ লাগল তার একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই এত কথা মনে হয়েছিল আমার। বাচ্চাটাকে ধরে রেখেছিলুম আমার গ্লাভস-পরা দুটি হাতের তালুতে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ওর কণ্ঠনালীতে স্পর্শ করে আছে। নিজের অজান্তেই সেটা কঠিন হয়ে উঠল। আর দশ সেকেন্ড তার পরেই অক্সিজেনের অভাবে ওর হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। যদি নেহাৎ না যায় একটু চাপ দিলেই হবে আঙুলের! হ্যাঁ, আর দেরী করা উচিত নয়। মেয়েটির সমস্ত জীবনব্যাপী অপমান, লাঞ্ছনা আর হাহাকারের চরম শাস্তি আমার হাতেই ঘটে যাক। ওকে আমি মুক্তি দিই। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটায় একটু চাপ দিতে গেলুম।

"কী বিচিত্র এ জীবনের খেলা! কী অপূর্ব পরিকল্পনা দীন-দুনিয়ার মালিকের। ঠিক সেই মুহূর্তেই অপারেশন থিয়েটার বিদীর্ণ করে কে যেন চীৎকার করে উঠল মার্ডার! খুন! খুন!

"আমি এমনভাবে চমকে উঠেছিলুম যে আমার হাত থেকে বাচ্চাটা হয়তো পড়েই যেত আর একটু হলে। কে অমনভাবে চীৎকার করে উঠল? আমার বিবেক? হঠাৎ লক্ষ্য হল আমার হাত থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিচ্ছে নার্স। বুঝতে পারলুম ঘটনাটা। না, আমার বিবেক নয়, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে সদ্যোজাত শিশুটিই আর্তনাদ করে উঠেছে। না, আর্তনাদ নয়, জয়োল্লাস! জীবনের বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে সে চীৎকার করে।

"এ কথা আজও কেউ জানে না। ঠিক সেই চরম মুহূর্তে বাচ্চাটা যদি কেঁদে না উঠত, তাহলে এই আত্মজীবনীতে আমাকে আজ স্বীকার করে যেতে হত—আমি খুনে, মার্ডারার! ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন এক মুহূর্তের জন্য। তবু আজও মনে হয়, 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' অপরাধে আমার শাস্তি হওয়া উচিত। আমার এ স্মৃতিকথা পড়ে পাঠক যদি আমাকে ঘৃণা করেন, তাহলে সেই ঘৃণাই হবে আমার শাস্তি। তাঁদের তিরস্কারেই হবে আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

— মা-মণি!

শর্মিলা মুখ তুলে তাকায়। পড়তে পড়তে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবে ফিরে আসে এতক্ষণে। শিখা উঠে এসেছে তার কাছে। কনুই থেকে কাটা হাতখানা দিয়ে সে ওকে মৃদু মৃদু ঠেলছে। বই মুড়ে উঠে বসে শর্মিলা, বলে—কী রে?

—মিঠুয়া আজ সকালেও কিছু খায়নি মা-মণি। কাল থেকে না-খেয়ে আছে।

শর্মিলা বিরক্ত হয়ে বলে—তা না খেলে আমি কী করব?

তাকায় সে মিঠুয়ার দিকে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে তেমনি ভাবেই শুয়ে আছে মিঠুয়া।

শিখা বলে – মিঠুয়া কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শর্মিলা উঠে পড়ে। হাতঘড়িতে দেখে প্রায় বারোটা বাজে। এবারে ওদের খেতে দেবার সময়। এখনই ঘণ্টা পড়বে একতলার পেটা ঘড়িতে। বলে—হঠাৎ মিঠুয়া এত চটে গেল কেন রে?

শিখা জবাব দেয় না। শর্মিলার আঁচলটা বাঁ হাতের আঙুলে জড়াতে থাকে —কিরে, কথা বলছিস না যে?

কি জানি কেন লজ্জা পায় শিখা। মুখ লুকিয়ে বলে –মিঠুয়া জানতে পেরেছে।

—জানতে পেরেছে! কী জানতে পেরেছে?

—আমরা সবাই জানি। দিদি যখন বড় মাস্টার-মশাইকে বলছিলেন তখন পাশের ঘর থেকে আমরা সব শুনেছি।

শর্মিলা কৌতূহলী হয়ে ওঠে—কী বলছিল মিনি?

—তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তুমি আমাদের ছেড়ে দিল্লি চলে যাবে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল শর্মিলা!

আশ্চর্য! তবু মাস্টার-মশাই তাকে কিছু বলেন নি! আর তাই আজ মিঠুয়ার এই দুরন্ত অভিমান! ও যে ঘরপোড়া গরু। বাপকে ভালবেসেছিল; সেই বাপ ওকে ফেলে পালিয়েছে বিয়ে করতে। আজ সে তার মা-মণিকে ভালবাসে। আজ আবার তার মা-মণি তাকে ফেলে পালাবার তাল করছে। এবারও সেই বিয়ে করতে।

কেমন যেন বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে শর্মিলার। একবার ভাবে, না, এভাবে সে চলে যেতে পারবে না। এতগুলি অনাথ ছেলেমেয়েকে ভাসিয়ে মাস্টার-মশাইকে অকূল সমুদ্রে ফেলে সে চলে যেতে পারবে না। বিকাশ তাকে কী দেবে? ঘর, সংসার, সন্তান? না, চাই না তার। এই তার ঘর, এই তার সংসার, এতগুলি তার সন্তান।

ঢং ঢং করে খাবার ঘণ্টা পড়ল নিচেকার পেটা ঘড়িতে।

ভূতের গল্প কিন্তু আর শোনাতে হয়নি শর্মিলাকে। ছেলেরা ওর জরিমানা মাপ করে দিয়েছে। একটা অঙ্গহানি হলে ভগবান বোধ হয় অন্য কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দেন। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই ছেলেরা বুঝতে পারে কিছু একটা অঘটন ঘটে গেছে আজ। মা-মণির মুখটা থমথম করছে। মাস্টার-মশায়ের সেই সদাহাস্যময় মুখে নেমেছে অমাবস্যার অন্ধকার। মানদা একবার চুপিচুপি বলে গেল—আজ আর কেউ দুরন্তপনা করো না।

দেখছ তো ব্যাপার ?

হ্যাঁ, তা দেখেছে বইকি। কী যে হয়েছে তা কেউ জানে না, তবে কিছু একটা যে হয়েছে এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি ওদের আছে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে মা-মণির অনেকক্ষণ ধরে কী যেন কথাবার্তা হয়েছে, তা ওরা জানে। মা-মণি ওদের ছেড়ে চলে যাবেন, এমন একটা কানাঘুষাও শোনা যাচ্ছে। বুদ্ধিমান ওরা, তাই আর গল্প শোনার বায়না ধরল না আজ।

বেলা তিনটে নাগাদ সে বেরিয়ে পড়ে। প্লেন আসবে সন্ধ্যা সাতটায়। এত আগে বের হবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু কি-জানি-কেন ঐ বাড়িটা যেন আজ ওর বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। কতকগুলো বিকৃত বিকলাঙ্গ মাংসপিণ্ড! ওখানে কি থাকা যায়? প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। নাঃ, ওখান থেকে পালাতে হবে। এ দুনিয়ায় স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা কিছু নেই। শুধু স্বার্থের খেলা। এ পৃথিবীতে যারাই সুখী হয়েছে তারাই স্বার্থপর। ভদ্রভাষায় তাকে আত্মকেন্দ্রিক বলতে পার—তাতে শব্দটাই বদলায়, ভাবার্থটা একই থাকে।

মা, দাদা, বউদি ওঁরা চান সে বিকাশের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধুক। বিকাশ ওদের সমাজের মানুষ, তার পদমর্যাদা আছে, অর্থকৌলিন্য আছে। এমন জামাই গর্ব করে পাঁচজনকে দেখানো যায়। তাই তাদের গরজ। উমা ছুটে এসেছিল তার বউদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। উদ্দেশ্য সেই এক—স্বার্থ। দাদার সংসারে কতদিন সে হাঁড়ি ঠেলবে? কে জানে, এতদিনে হয়তো মনের মানুষের সন্ধান সেও পেয়ে গেছে। দাদার হেঁসেলের ভার কারও ঘাড়ে চাপাতে পারলে সেও নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘর বাঁধতে যেতে পারে। ও চলে যাবে শুনে মিনি মিত্তির আজ খুশীতে ডগমগ। ভণিতা করে আবার শুভেচ্ছা জানানো হল। সেও সেই স্বার্থের খেলা। শর্মিলা থাকায় এ প্রতিষ্ঠানে সে একাধিপত্য বিস্তার করতে পারছিল না। এতদিনে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হল। স্বার্থান্ধ কে নয়? ঐ যে ছোট্ট মিঠুয়া, ওর অভিমানের মূল কোথায়? মা-মণির উপর সে নির্ভর করেছিল। আজ সেই মা-মণি তাকে ছেড়ে চলে যাবে শুনে সে ক্ষেপে গেছে। শুনতে খারাপ লাগছে কিন্তু সেও কী ঐ স্বার্থের নির্দেশে নয়?

এমন কি অমন যে মহামানব মাস্টার-মশাই, তাঁর ব্যবহারটাই বা কি? সমস্ত কথা শুনে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—নূতন সংসারে গিয়ে তুমি শান্তি পাও এই কামনা করি।

শর্মিলা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন সহজে, এমন অনায়াসে তিনি বিদায় জানাবেন তা যেন কল্পনাই করেনি। কিন্তু মাস্টার-মশায়ের মুখোশও খুলে

পড়ল অচিরে। সেই একই কথা—স্বার্থ!

শর্মিলা বললে—আপনার খুবই অসুবিধা হবে। কাকেই বা দায়িত্বভার দেবেন এর পর?

মাস্টার-মশাই ড্রয়ার থেকে একখানা খাম বার করে বলেছিলেন—ভালো কাজে ভগবানই সাহায্য করেন। এ চিঠিখানা মাসতিনেক আগে পেয়েছিলাম। জবাবে লিখেছিলাম, সময়মত জানাব। এ দিন যে একদিন আসবেই তা জানতাম আমি। এবার সময় হয়েছে। এবার আসতে বলব ওদের।

চিঠিখানা হাতে করে বোকার মতো দাঁড়িয়েই থাকে শর্মিলা।

—পড়ে দেখ।

যন্ত্রচালিতের মতো খাম থেকে চিঠিখানা বার করে পড়ে। চিঠি লিখেছে উমা। আনন্দের জবানীতে। সংক্ষেপে জানিয়েছে তার একক জীবনের কথা, তার দৃষ্টিহীনতার কথা। কর্মহীন মানুষটা মাস্টার-মশায়ের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে। উমাকে নিয়ে সে এখানে চলে আসতে চায়। উমা এখানে অনেক কাজ করতে পারে। অন্ধ হলেও আনন্দ অনেক কাজে সাহায্য করতে পারে মাস্টার-মশাইকে। খোলাখুলি লিখেছিল মাহিনা সে চায় না, শুধু আশ্রয় চায়।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে শর্মিলার। দাম্পত্যজীবনের সমস্যার কথা আনন্দকে বলতে হয়েছে। অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্বচ্ছভাষায় বলেছে তা। জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে নাকি ভুল হয়েছিল আনন্দ মিত্রের। ধনী পিতার কন্যা তার মতো নিম্নমধ্যবিত্তের সংসারে অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রসাধনে অশক্ত হওয়ায় সে তাকে মুক্তি দিয়েছে।

মাস্টার-মশাই বলেন—আনন্দ তো জানে না যে, তুমি এখানেই কাজ করছ!

শর্মিলা কোন জবাব দেয়নি। চিঠিখানা ফেরত দিয়েই উঠে পড়েছিল। এ বিষয়ে সে মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে রাজী নয়। মোট কথা, তাই মাস্টার-মশাই আজ মুষড়ে পড়েননি। শর্মিলা যেতে চায় যাক—উমা আসবে দায়িত্ব নিতে। তার উপর আসছে তাঁর প্রিয় ছাত্র। অন্ধ হলেও আনন্দ পণ্ডিত ব্যক্তি। ভাল জাতের শিক্ষক সে। বিনা মাহিনায় এমন একজন শিক্ষক পাওয়াও ভাগ্যের কথা। ফলে শর্মিলাকে হারানোর চেয়ে প্রাপ্তির পাল্লাটাই আপাতত ভারী হয়ে উঠেছে বৃদ্ধের কাছে।

কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? বেলা পড়ে আসছে। কর্মক্লান্ত কলকাতা শহরে মানুষজনের ছোটাছুটির বিরাম নেই। সকলেরই কাজ আছে, আছে গন্তব্যস্থল। শুধু শর্মিলারই আজ কোনও কাজ নেই, কোথাও যাবার জায়গা

নেই। আর বাসের ঠেলাঠেলি ভাল লাগছে না। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে সে চলে গেল দমদমের দিকে। সন্ধ্যা সাতটায় প্লেন আসবে। হাতে এখনও ঘণ্টা তিন-চার সময় আছে। তা থাক। এ শহরের হাত থেকে সে পালাতে চায়। দমদমের বিমানঘাঁটিতে কোন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে সে বসে থাকবে একা। সেই ভাল। মানুষজনের সান্নিধ্যও যেন ওর আর ভাল লাগছে না আজ।

এয়ারোড্রোমেও লোকের ভীড়। শর্মিলা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় একটা ফাঁকা মাঠের দিকে। মনে পড়ল হাত ব্যাগে এখনও আছে সেই গল্পের বইটা। সেই আমেরিকান ডাক্তারবাবুর স্মৃতিকথা। সেই ভাল। বই পড়ে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাক। কতদূর পড়েছিল সে? ঠিক মনে নেই। যাক, যে কোন একটা পরিচ্ছেদ থেকে পড়লেই হবে। একেবারে পিছন দিকের একটা পাতা খুলে পড়তে শুরু করে দেয়ঃ

আমার জীবনের অনেকগুলি কেস হিস্ট্রি পাঠককে শুনিয়েছি। আমার কাছে সেগুলি ছিল রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের হাসিঅশ্রু বিজড়িত বাস্তব কাহিনী পাঠকের কাছে সেগুলি কোন কাহিনীর চরিত্রমাত্র। তাছাড়া আমি লেখক নই, চিকিৎসক। তাই হয়তো পাঠক ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আর একটি খণ্ড কাহিনী লিপিবদ্ধ করেই আমি ছুটি নেব।

মাত্র গত বৎসরের কথা। এখন আমি বৃদ্ধ। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছি কিছুদিন হল। ঘুরে বেড়াচ্ছি এ দেশ থেকে সে দেশে। বিদায় নেবার আগে এই পৃথিবীটাকে একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই। গত বছর সেপ্টেম্বরে ছিলাম ভিয়েনায়। ওখানকার একটি হাসপাতালের কর্মকর্তা আমার ছাত্র। একদিন সে এসে আমাকে নিমন্ত্রণ করে গেল। ওদের সঙ্গে ডিনারে যোগ দিই তাহলে ওরা খুব খুশী হবে। বস্তুত ভিয়েনা হচ্ছে শল্যচিকিৎসকদের স্বর্গ, শহরের যাবতীয় জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতকে ওরা নিমন্ত্রণ করেছে—ফলে এই সুযোগে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হবে। আমি গ্রহণ করলাম ওদের নিমন্ত্রণ।

নির্ধারিত দিনের সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম ওদের হাসপাতালে। ডিনারের আগে একটা অনুষ্ঠান ছিল, সেখানেই নিয়ে গেল আমাকে। প্রকাণ্ড একটা থিয়েটার 'হল'। ফুল আর চীনেলণ্ঠনে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। আমি যেতেই কয়েকটি মেয়ে এসে ছোট্ট ফুলের 'বুকে' দিয়ে স্বাগত জানাল। সামনের একটি আসনে নিয়ে গিয়ে বসাল। আমার ছাত্রটি সস্ত্রীক এসে অভ্যর্থনা করল। আলাপ করিয়ে দিল কয়েকজনের সঙ্গে। সকলেই কৃতবিদ্য চিকিৎসক। একটু পরেই আলো নিবে গেল হলের। শুরু হল বিচিত্র অনুষ্ঠান।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি একের পর একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। ব্যালে নাচ,

অর্কেস্ট্রা। শেক্সপীয়রের একটি খণ্ডদৃশ্য। অভিভূত হয়ে গেছি আমি। বিরতির পূর্বে ঘোষিত হল এবার বিশ্ববিশ্রুত ভায়োলিন-বাজিয়ে মিসেস এলিজা জোন্স আপনাদের 'সোনাটা' বাজিয়ে শোনাবেন। পার্শ্ববর্তী ডাক্তারবাবু আমার কানে কানে বলেন, মিসেস জোন্সের বেহালা বাজনা নিশ্চয় শুনেছেন আপনি?

আমি বলি, কই না। এ কথা মনে করছেন কেন?

—বাঃ! এ মেয়েটি তো বি. বি সি-র বাঁধা আর্টিস্ট। সম্প্রতি বিয়ে করে হানিমুনে এসেছে ভিয়েনায়। ঘটনাচক্রে ওকে পাওয়া গেছে আজকের অনুষ্ঠানে।

তাই নাকি! তা হবে। আমি গান-বাজনার বিশেষ ভক্ত নই।

স্ক্রীন উঠে গেল আবার। উইংস্-এর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। সাদা সিল্কের একটি গাউন পরেছে। সুন্দর দেখতে। বয়সে ভরা ভাদ্র। কানায় কানায় ভরা। মঞ্চের মাঝখানে এসে বাও করে দর্শকদের দিকে ফিরে। আবির্ভাবমাত্র করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ। বোঝা গেল, আমি না চিনলেও লিজির বহু গুণগ্রাহী এখানে উপস্থিত। মাইকের সামনে এসে ভায়োলিনখানি থুতনিতে চেপে ধরে আলগোছে ছড় টানে তার উপর। শুরু হয়ে গেল বাজনা।

সঙ্গীতের ব্যাপারে আমি তালকানা; কিন্তু আশ্চর্য, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ। মনে হল দুনিয়ায় আমি একা। স্কটল্যান্ডের লেক-অঞ্চলে শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে শুয়ে শুয়ে শুনছি ম্লান চন্দ্রালোকিত ড্যাফো ডিলের দিগন্ত অনুসারী আর্তি! সে বেদনা কিসের তা বুঝতে পারছি না, তবু হু হু করে উঠছে বুকের মধ্যে।

কতক্ষণ বাজনা শুনেছি জানি না, আত্মস্থ হলাম যখন, তখন মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়তে চাইছে। মেয়েটি মাথা নিচু করে বাও করল আবার। করতালি মুখরিত প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। মনে হল, যে শুধু একটা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে এমন আত্মহারা করে দিতে পারে তাকে অভিনন্দন না জানিয়ে আমি চলে যেতে পারব না। সুরের সুরধনীতে অবগাহন স্নান করে আমি যেন নূতন পৃথিবীতে জেগে উঠেছি।

স্টেজের প্রবেশদ্বারে যে মেয়েটি ছিল সে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল কাকে খুঁজছেন ডক্?

বললুম, যে মেয়েটি এই মাত্র ভায়োলিন বাজালো তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—লিজিকে চেনেন বুঝি?

—না চিনি না ; কিন্তু ওকে অভিনন্দন না জানিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি না।

মেয়েটি খুশী হল ; বললে, আসুন ভিতরে, বসুন। ও বোধ হয় গ্রীনরুমে ঢুকেছে, ডেকে দিচ্ছি।

আমাকে একটি সোফায় বসিয়ে মেয়েটি ভিতরে খবর দিতে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে, ও জামা কাপড় বদলাচ্ছে ; একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে আপনাকে একেবারে একা বসে থাকতে হবে না। ইনি লিজির মা। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

প্রৌঢ়া মহিলাটি আমার হাত ধরে বলেন, আপনি যে নিজে লিজিকে অভিনন্দন জানাতে উঠে আসবেন তা ভাবতেই পারিনি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি বলি, সে কি! ধন্যবাদ তো আমিই দেব। সত্যি আপনি রত্নগর্ভা। এমন অপূর্ব সুরবিস্তার আমি জীবনে শুনিনি। আপনার কন্যাটি তো সুরভারতী।

ভদ্রমহিলার চোখের কোণটা ভিজে ওঠে আনন্দে ; বলেন, কিন্তু এ জন্য কৃতিত্ব আমার যতটা প্রাপ্য আপনার প্রাপ্য তো তার চেয়েও বেশী।

একটু যেন ধাঁধায় পড়লাম। কী বলতে চান ভদ্রমহিলা? আমার সেই সপ্রশ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে উনি আবার বলেন, আপনি অবাক হচ্ছেন, হওয়ার কথাই। কারণ আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।

ভাল করে আবার তাকিয়ে দেখি ভদ্রমহিলার দিকে। কোনদিন তাঁকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না। সলজ্জে সে কথা স্বীকার করবার উপক্রম করতেই উনি বলে ওঠেন, তা তো হতেই পারে। জীবনে হয়তো আমার মতো লক্ষ রোগিণীকে চিকিৎসা করেছেন আপনি। আমি এককালে আপনার পেশেন্ট ছিলাম।

—তা হবে।

কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে এল ওঁর মেয়েটি। মিসেস্ এলিজা জোন্স এখন আর সাদা গাউন নয়, সবুজ একটা ফ্রক, গায়ে ফার কোট, হাতে কালো দস্তানা। গলায় সাদা মুক্তোর একছড়া মালা। সোনালী পশমের মতো একরাশ চুল, আত্মতৃপ্ত দৃষ্টি। সশ্রদ্ধ অভিবাদন করল আমাকে। আমি ওকে অভিনন্দন জানাবার আগেই প্রৌঢ়া বললেন, লিজি, ইনি কে জান? ডক্টর—। তোমার জীবনদাতা। এঁরই দয়ায় আজ তুমি পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করছ।

আমার আর অভিনন্দন জানানো হল না। বোকার মতো ঘুরে দাঁড়ালুম প্রৌঢ়ার মুখোমুখি। প্রশ্ন করতে চাইলুম, কে ছিল আমার রোগিণী, মা না মেয়ে? ওর মা কিন্তু তার আগেই লিজিকে বলেন, সবাই যখন ভেবেছিল

তুমি মৃত তখন উনিই আমাকে সিজারিয়ান করে তোমাকে উদ্ধার করেন।

আমি চমকে উঠে বলি, কোথায় বলুন তো? কোন হাসপাতালে?

—মিশিগানে। আপনার মনে থাকার কথা নয়। আমার স্বামী ছিলেন অটোমোবাইল এঞ্জিনিয়ার সি. এফ স্মিথ।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তা কেমন করে হবে? আপনা থেকেই আমার দৃষ্টি নত হয়ে গেছে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি মিসেস্ এলিজাবেথ জোন্সের বাঁ পায়ের দিকে।

প্রৌঢ়া হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, আহ্। নাউ য়ু রেকলেক্ট! তুমি ওর বাঁ পায়ের দিকে তাকিয়েছ! ইয়েস, এই সেই মেয়ে! যার প্রাণ তুমি দিয়েছিলে ডক্!

—কিন্তু ওর পা?

—ওটা কাঠের। কী অদ্ভুত উন্নতি করেছ তোমরা চিকিৎসা বিদ্যার। কেউ দেখে বুঝতেই পারে না। লিজি শুধু হাঁটতেই পারে না শী ক্যান সুইম শী ক্যান রান, শী ক্যান ইভন ডান্স!

আমার চোখের সামনে হাজার বাতির আলো সমেত স্টেজটা তখন দুলছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার রবারের গ্লাভস্-পরা দুটি হাতের উপর একটি ছোট্ট মাংসপিণ্ড। তার কণ্ঠদেশে. ঐ যেখানে এখন সাদা মুক্তোর মালাটা দুলছে. ঐ গলায় আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা চেপে বসেছে। একটি বিকলাঙ্গ মেয়ের সমস্ত জীবনের অপমান, লাঞ্ছনা আর হাহাকারকে একটি ফুৎকারে নিবিয়ে দেবার শুভ ইচ্ছা নিয়ে আমি খোদার উপর খোদাগিরি করতে চলেছি। আমি খুন করতে উদ্যত।

ইচ্ছে হল অন্ধ আবেগে একটা আর্ত চীৎকার করে উঠি। ঠিক যেমন ভাবে আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আর্তনাদ করে উঠেছিল মিশিগানের ও টি-তে সেই বিকলাঙ্গ মাংসপিণ্ডটা।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা লিজি!

বই বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে শর্মিলা। মনে পড়ে যায় মিঠুয়ার কথা। ছোট্ট মিঠুয়া। তারও অমন সোনালী পশমের মতো চুল, হয়তো লিজিরও ছিল ঐ রকম জ্বলজ্বলে দুটি দুষ্টু চোখ এই বয়সে। হয়তো লিজিও ছিল ছেলেবেলায় ঠিক এই রকমই অভিমানী। কে জানে! আচ্ছা, মিঠুয়া যদি ভারতবর্ষে না জন্মাত, সে যদি পশ্চিমখণ্ডের কোন পরিবারে প্রথম চোখ মেলত পৃথিবীর বাতাসে? তাহলে সেও কি ঐ লিজির মতো দেশের একজন, দশের একজন হয়ে উঠত? মনে পড়ল মনীশবাবুর মেধাবী সন্তান মন্টুর কথাও। যার নামে ওদের প্রতিষ্ঠান। আচ্ছা, মন্টু যদি এই বইখানা

পড়ত, লিজির কথা শুনত, তারপরেও কি আত্মহত্যা করতে পারত সে? মনীশবাবুর ডায়েরীটা শর্মিলা বারে বারে পড়েছে। অদ্ভুত অ্যানালিটিক্যাল মন মনীশবাবুর। মণ্টুর প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ তিনি লক্ষ্য করেছেন—লিপিবদ্ধ করেছেন, আর সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন কী ভাবে ওদের মনে উৎসাহ ফিরিয়ে আনা যায়। মণ্টুর সঙ্গে যে এক্সপেরিমেন্ট উনি করছিলেন তাতে ফল হয়নি। মনীশবাবুকে সাময়িকভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছিল—কিন্তু তিনি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে জয়ী হবার সংকল্প নিয়ে সর্বস্ব পণ করে বসেছেন। মনীশবাবু লিখেছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন তিনি। শর্মিলা তাঁকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হত, কিন্তু উপায় নেই। তাকে চলে যেতেই হবে। এখনও শর্মিলা বারে বারে ঐ ডায়েরীটার পাতা ওলটায় আর ভাবে, কেন হঠাৎ হতাশ হয়ে পড়ল মণ্টু! কেন সে মৃত্যু ছাড়া আর কোন সমাধান খুঁজে পেল না তার সমস্যাকণ্টকিত জীবনে! শর্মিলার মনে হয় সে যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই মণ্টুকে অন্য পথের সন্ধান দিতে পারত। তাকে বুঝিয়ে দিতে পারত একটিমাত্র অঙ্গহানিজনিত কারণে এ দুনিয়ার সবকিছু হারিয়ে যায় না। সে হার স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে কোনও পৌরুষ নেই, কোন সান্ত্বনা নেই। আমেরিকান পাইলট ক্যাপ্টেন ডেভিড যদি দুটি পা ছাড়াই জীবনে সার্থকতা খুঁজে পায়, বিকলাঙ্গ মিস্ স্মিথ হতে পারে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক মিসেস এলিজাবেথ জোন্স তাহলে শিখা-মিঠু-নন্দা-অঞ্জন-মণ্টুরাই বা হতাশ হবে কেন? ডেভিড আর লিজি দুজনেই আজ বিবাহিত, তাদের জীবনের যারা সঙ্গী তারা বিকলাঙ্গ নয়—তারা সুস্থ সবল মানুষ। কই, ওদের জীবন তো ফুলে ফলে ভরে উঠবার পথে কোন বাধা হয়নি! তাহলে এ দেশেই বা তা হবে না কেন!

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে ওর। একটানা চিন্তার গঙ্গায় জেগে উঠল একটা চর। আবর্তে ঘুলিয়ে উঠল চিন্তাস্রোত। কে যেন ওর মনের মধ্যে বলে উঠল—আর যেই ভাবুক, তোমার ও কথা ভাবা শোভা পায় না।

ওর মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল দুটি সত্তা। একজন বলে—অন্তত তুমি ও কথা বল না!

আর একজন প্রতিবাদ করে—কেন বলব না? তুমি কি ভেবেছ, আনন্দ অন্ধ, তাই আমি সরে এসেছি তার কাছ থেকে?

—যদি বলি তাই!

—তাহলে আমি বলব, আমি যখন তার আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছিলুম তখন সে অন্ধ ছিল না।

—আর আমি যদি বলি, এখন তুমি ফিরে যাচ্ছ না শুধু ঐ কারণেই!

—তাহলে আমি বলব, তুমি কিছুই জান না আমার কথা। আনন্দ আবার

নূতন করে অন্ধ হবে কি? সে তো জন্মান্ধ। চোখ থাকতেও সে কোনদিন আমার দিকে চোখ তুলে দেখেছে?

একটা প্লেন উঠল আকাশে।

চমক ভেঙে সোজা হয়ে বসল শর্মিলা। খুব নিচু দিয়ে প্লেনটি চক্রাকারে পাক খেয়ে চলে গেল গাছের উপর দিয়ে, মাঠের সীমানা পেরিয়ে ঐ দূর নীল আকাশের নিলীমার ওপারে।

শর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। পায়চারি করতে থাকে। ট্যাক্সি আসছে যাচ্ছে। এয়ার ইণ্ডিয়ার লাউড স্পীকারে কী একটা ঘোষণা হচ্ছে। যশোর রোড দিয়ে ক্রমাগত গাড়ির ছোটাছুটি। মানুষজন চলেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে পশ্চিম দিগন্তে। লালে লাল হয়ে গেছে ওদিকের আকাশটা।

সেই অস্ত-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে শর্মিলার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়! মনে হয় একটু আগে অহেতুক রাগ করেছিল সে। মনে হয়েছিল, এ দুনিয়ার সবাই স্বার্থপর, মানুষ মাত্রেই আত্মকেন্দ্রিক, মনে হয়েছিল, মানুষের প্রতিটি কাজের মূলে ঐ স্বার্থের গন্ধ।

কিন্তু ঠিক কি তাই? মা দাদা যদি চোখের উপর শর্মিলার অবস্থা দেখে স্থির থাকতে না পারেন সেটা কি তাঁদের অপরাধ? না তাঁদের স্বার্থপরতা? স্বার্থপর হলে তো দাদা বউদিকে নিয়ে আলাদা বাসা করে উঠে যেত! রমলা বিরক্তি প্রকাশ করত তার ঘরের ভাগীদারের প্রত্যাবর্তনে। উমা যদি সত্যিই আত্মকেন্দ্রিক হত তা হলে দাদার জন্য তার মাথাব্যথা হবে কেন? মাস্টার মশাই জানতেন শর্মিলা আজ বাদে কাল চলে যাবেই। তাই উমা আর আনন্দের উপর যদি তিনি নির্ভর করে থাকেন তাহলে তাঁর অন্যায়টা কোথায়? তাছাড়া মাস্টার-মশাইয়ের সমস্ত প্রচেষ্টাটাই তো পরার্থে। এ বয়সে তাঁর তো অবসরজীবনে আরাম করার কথা। এ প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে তিনি প্রাণপাত করছেন কি স্বার্থপরতার নিদর্শন রাখতে? এর মধ্যে স্বার্থপর যদি কেউ থাকে, তাহলে ভেবে দেখ শর্মিলা, সে একমাত্র তুমিই! হ্যাঁ, আর কেউ নয়, তুমি—শর্মিলা মিত্র।

তোমারই স্বার্থে তোমার স্বামী আজ দৃষ্টিহীন। আত্মসুখসন্ধানী তুমি তার চোখের সামনে থেকে এই রূপসী পৃথিবীকে সরিয়ে নিয়েছ আর তারপর বিপদ বুঝে সরে দাঁড়িয়েছ। তুমি জান, আনন্দ আজ উপার্জনক্ষম নয়। দারিদ্র্যের করাল মূর্তি তুমি দেখেছ তাই অন্ধ স্বামীর ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস আজ আর নেই তোমার। শৈশব থেকেই তুমি আদরে মানুষ। যা চেয়েছ, যা বায়না ধরেছ তাই পেয়েছ। রোম্যান্টিক প্রেম করবার শখ হল তোমার—তাই সকলের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে গেলে আত্মভোলা আনন্দের কুটিরে। কিন্তু সেখানে পদার্পণ করার পরেই তোমার উপলব্ধি হল এতে

তোমার মতো মেয়ে সুখী হতে পারে না। তুমি শাড়ি চাও, বাড়ি চাও, গাড়ি চাও—নিত্য নূতন আবরণ আর আভরণ না হলে তোমার মন মানে না। আজ তুমি বুঝতে পেরেছ তোমার সেই বাসনা কামনাকে যে চরিতার্থ করতে পারবে সে ইস্কুলমাস্টার আনন্দ মিত্তির নয়, সে প্রভূত বিত্তশালী বিকাশ গুপ্ত। তাই আজ নূতন করে বিকশিত হবার বাসনা নিয়ে এসে ধর্ণা দিয়েছ দমদম এয়ারোড্রোমে। তিনঘণ্টা আগে থেকে এসে বসে আছ, শিকার না ফসকে যায়! ছি ছি ছি!

শর্মিলার মনে হল সে পালিয়ে যায়। শুধু এখান থেকে নয়, নিজের কাছ থেকে। নিজের মনের ঐ যে অংশটা ওকে ধিক্কারে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে বারে বারে, মনের ঐ অংশটার হাত থেকে দূরে। কিন্তু যাবে কোথায়? ছায়ার মতো মনও যে ওর নিত্যসঙ্গী। আর তা ছাড়া সে যে কথা দিয়েছে একজনকে। তার কথার উপর নির্ভর করে একটা মানুষ ছুটে আসছে দিল্লী থেকে, তাকেই বা বলবে কি?

—কিন্তু কথা কি তুমি শুধু ঐ একজনকেই দিয়েছ শর্মিলা? আর কাউকে জীবনে কখনও কথা দাওনি? মনে করে দেখ দেখি, আরও একজন মানুষ তোমাকে একবার বলেছিল না কি, এখনও ভেবে দেখ শমু, আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়াবে কি না। তুমি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছ, আদরে লালিত হয়েছ, আমার সংসারে নিত্য অভাব অনটনের মধ্যে পড়ে—

—বাধা দিয়ে সেদিন তুমি তাকে কী বলেছিলে শর্মিলা? কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে?

না। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই ও বুঝি শেষ হয়ে যাবে একদিন।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। হ্যাঁ, সময় হয়েছে এতক্ষণে।

রানওয়ের প্রান্তে এসে আকাশচারী দৈত্যখানটা শেষ পর্যন্ত থামল। ক্রু এসে খুলে দিল দরজা। চাকা লাগানো সিঁড়িটা এনে লাগিয়ে দিল খোলা দরজার সামনে। একে একে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মানুষ জন। শর্মিলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ঐ তো বিকাশ! হাতে একটা এয়ার ব্যাগ। মাথায় টুপি, ছাই রঙের একটা স্যুট কোটের বটনহোলে টকটকে লাল একটা বড় গেলাপ। বিকাশ চারিদিকে তাকাচ্ছে। সত্যি নায়কোচিত চেহারা বলতে হবে বিকাশের। কী টল! অথচ দিব্যি মানানসই। ঠিক স্মার্ট বলতে যা বোঝায়। যাই বল, ধুতি পাঞ্জাবিতে পুরুষ মানুষের ব্যক্তিত্বটা ঠিক মতো ফুটে ওঠে না। কেমন যেন ন্যাতাজোবড়া ভাব। এ কথা কতবার শর্মিলা বলেছে আনন্দকে; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! সেই ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি আর কোঁচা-

দোলানো ধুতি, সেই মোটা চশমা, অবিন্যস্ত চুল আর কাঁধে চাদর। টিপিক্যাল মাস্টার!

কিন্তু এসব কী ভাবছে শর্মিলা! ঐ যে বিকাশ চারিদিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজছে। শর্মিলা হাত নাড়ল। ঐ তাকে দেখতে পেয়েছে বিকাশ। জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে আসে সে।

—সত্যিই এসেছ তাহলে?

—আসব না কেন? তুমি দিল্লী থেকে উড়ে আসতে পারলে, আর আমি নিউ আলিপুর থেকে ছুটে আসতে পারব না?

—আমার কিন্তু তবু সন্দেহ ছিল।

—তা তো থাকবেই। তোমার চিরকালই যে সন্দেহবাতিক। কই, তোমার মালপত্র কই?

—চল, মালটা খালাস করি আগে।

বাড়ির গাড়ি আসেনি শুনে খুশী হল বিকাশ। বললে—ভালই হয়েছে। বাড়ির গাড়িতে বান্ধবী নিয়ে বেড়ানো, আর বাড়ির ছাদে উঠে পিকনিক করা ও দুটোই একজাতের। তার চেয়ে কোন সর্দারজীর ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি চল।

শর্মিলা বলে—সর্দারজি কেন? বাঙালী জাতটা এই জন্যেই মরে। নিজের জাতের লোকেই যদি তাদের না দেখে—

হাত দুটি জোড় করে বিকাশ বলে—এ ক্ষেত্রে আমি নাচার। অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে গাড়ি করে যাব এমন একজন ড্রাইভার চাই যে, পিছনের কথোপকথন শুনলেও বুঝতে পারবে না।

বিকাশ করিৎকর্মা ছেলে মালপত্র গুছিয়ে রেখে গেল ট্যাক্সি ডাকতে। একটু পরেই ফিরে এল ট্যাক্সি নিয়ে। সত্যিই বিশালকায় পাঞ্জাবী সর্দারজীর গাড়ি। দ্বার খুলে বিকাশ বললে—এস।

শর্মিলার হঠাৎ মনে হল ঐ দুই অক্ষরের কথাটি যেন বিশেষ অর্থবহ। এ যেন ট্যাক্সিতে উঠে বসার জন্য আহ্বান নয়, এর পিছনে যেন আরও কিছু ইঙ্গিত আছে। মনে হল বিকাশের এ ডাক শুধুমাত্র একটা যান্ত্রিক যাত্রার সঙ্গিনী হতেই শুধু নয় এ আহ্বান আরও গভীর ব্যঞ্জনাময়।

শর্মিলা উঠে বসল পিছনের সীটে।

ট্যাক্সি চলল আলোকোজ্জ্বল যশোর রোড দিয়ে।

অল্প একটু পরে শর্মিলা অনুভব করে তার হাতের উপর আস্তে আস্তে এসে আশ্রয় নিল আর একটি ঘামে ভেজা হাত। শর্মিলা বাধা দেয় না। বিকাশ বোধ হয় আর অগ্রসর হবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। শর্মিলাই ওকে সাহস যোগায়, বলে—অতবড় গোলাপটা পেলে কোথায়?

বিকাশ বললে—আসার সময় একজন দিল, না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়—আমারই বাগানের গোলাপ। যে তুলে দিল সে আমার হেড মালী।

—হেড মালী মানে, তোমার বাগানে কজন মালী?

বিকাশ সে কথার জবাব না দিয়ে বললে—কিন্তু গ্রে-রঙের স্যুটে লাল গোলাপ ঠিক মানায় না। কালো ব্যাকগ্রাউন্ড না হলে—

শর্মিলা বলে—তাই নাকি? কিন্তু কালো স্যুট তো এমন দিনে -

এবারও বাধা দিয়ে বিকাশ বলে—স্যুট কেন? কালো খোঁপাতেও মানাবে। বিশ্বাস না হয় দেখ -

এবারও বাধা দেয় না শর্মিলা। খোঁপায় ফুলটা গুঁজে দেবার সময় অত ছোঁয়াচ না বাঁচালেও হয়তো আপত্তি করত না সে। বরং একটু যেন হতাশই হল শর্মিলা।

কিন্তু এ কী! ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ালো চৌরঙ্গীরই সেই বিখ্যাত হোটেলটির সামনে।

শর্মিলা চমকে উঠে বসে—এ কি! এখানে কোথায়?

—এখানেই যে থাকব আমি। কাল সকালে যাব তোমাদের বাড়ি। এস. নাম।

শর্মিলা প্রতিবাদ করে—সে কেমন করে হবে? তোমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করে আছেন। আর তুমি হোটেলে উঠবে মানে?

—মানেটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব বলেই তোমাকে দমদমে আসতে বলেছিলাম। এস, নাম।

দেখা গেল বিকাশ দিল্লি থেকেই হোটেলে স্থান সংরক্ষণ করে তবে রওনা হয়েছে। শর্মিলা আর প্রতিবাদ করে না; মনে মনে কঠিন হয়ে ওঠে ক্রমে।

মালপত্র নিয়ে হোটেলের বয়টা চলে গেল ওর ঘরে। বিকাশ শর্মিলাকে নিয়ে লিফটে করে সেখানে পেঁছিবার আগেই তার মালপত্র পেঁছে গেছে, দেখা গেল। দু কামরার সুইট। সামনে একটি বসবার ঘর, পিছনেরটা শয়নকক্ষ। যে স্টুয়ার্টটি তাকে ঘরটি দেখিয়ে দিল বিকাশ তাকে বললে—এ হলুদ রঙের পর্দাটা বদলে দিও, ও রঙটা আমার পছন্দ নয়; ফিকে কোন রঙ হলেই ভাল; স্কাই ব্লু অথবা লাইট পিংক।

স্টুয়ার্ট অভিবাদন করে চলে গেল।

সামনের সোফাটি নির্দেশ করে বিকাশ বসল আর একটি গদি-আঁটা চেয়ারে। পাইপ আর পাউচটা বার করে টোব্যাকো পাকাতে পাকাতে বলল—কী খাবে বল? কী অর্ডার দেব?

শর্মিলা একটু আহত হয়ে বলে—তুমিই এসেছ কলকাতায়, আমি তো দিল্লি আসিনি।

বিকাশ স্যুটকেস খুলে একটি বেঁটে বোতল বার করে রাখল টিপয়ের উপর। তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অর্ডার দিল ওর তিনশো বাইস নম্বর ঘরে কিছু বরফের কুচি আর সোডার বোতল পাঠিয়ে দিতে। ফিরে এসে চাবিটাকে টেনে বার করল প্যান্টের হিপ পকেট থেকে। তাতে ছিল বোতল খোলার যন্ত্র। বোতলটা খুলতে খুলতে বলে – আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বাকি আছে। দেখ, আমি ছুটি নিয়ে আসিনি। এসেছি কোম্পানির কাজে। ফলে পাঁচটা লোকের সঙ্গে বিজনেস সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে হবে। তোমাদের বাড়িতে উঠলে—

শর্মিলা বলে—তা ঠিক। সেখানে এমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ পাওয়া যেত না বটে।

বিকাশ বলে—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত না হলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অন্য কিছু নিয়ন্ত্রিত হত নিশ্চয়ই। এভাবে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করবার সুযোগ হত না, এটা তো মান ?

শর্মিলা বললে—তা মানি। কিন্তু সত্যিই কি তুমি একটা সন্ধ্যাও এ সব না খেয়ে কাটাতে পারতে না ? না হয় খেতেই। মাকে সরিয়ে রাখতাম আমরা।

বেয়ারা এসে সোডার বোতল, বরফের কুচি আর টং দিয়ে গেল।

বিকাশ বললে—তাছাড়া আরও একটা বাধা ছিল, সে কথা তো তুমি জান ?

—আরও বাধা ? কী ?

একটু ইতস্তত করে বিকাশ বলে—তোমাদের লিগ্যাল সেপারেশন হয়ে যাবার আগে আমার পক্ষে তোমাদের বাড়িতে ওঠাটা কি ভাল দেখাতো ?

একটু চুপ করে থেকে শর্মিলা বলে—ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাদের বাড়িতে আমি একা থাকি না। সেখানে গেলে তুমি আমার দাদার বন্ধু হিসাবেই যাবে, এতে বাধাটা কোথায় ?

বিকাশ একটা শ্রাগ করে বলে—ওসব অপ্রিয় আলোচনাটা বরং মুলতুবী থাক। বল কী খাবে ? হট অর কোল্ড ?

শর্মিলা বললে—কিছুই আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বিকাশ। আমি বরং এবার উঠি।

—সে কি ! তোমার সঙ্গে কোন কথাই তো হয়নি।

—না হয় সে সব কথাও আপাতত মুলতুবী থাক।

একটু গম্ভীর হয়ে বিকাশ বলে—তোমার কি কোন তাড়া আছে ?

—তা আছে বইকি। আমাকে একবার বাড়ি যেতে হবে। ওঁরা তোমার জন্য এখনও অপেক্ষা করছেন।

— তার জন্যে তোমাকে বাড়ি যেতে হবে না। আমি এখনই ফোনে বলে দিচ্ছি।

শর্মিলা চুপ করে থাকে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে নাম্বার ডায়াল করার আগে বিকাশ আবার বলে—সেই সঙ্গে এ কথাও বরং বলে দিই তুমি রাত্রে বাড়িতে খাবে না।

হঠাৎ মিছে কথা বলে বসল শর্মিলা রাত্রে বাড়িতে খাব না—তা বাড়ির লোক জানে। আজ আমার এক বান্ধবীর ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আছে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বিকাশ বলে—কিন্তু এমন তো কথা ছিল না? তুমি জান আজ আমি আসছি। আজকের সন্ধ্যাটাও ফ্রি রাখনি?

শর্মিলা বলে—হোটেলে চিঠি লিখে সীট বুক করতে মনে থাকল আর, হোটেলে যে গেস্ট মীল বুক করেছ সেটা আমাকে জানাতে ভুললে?

বিকাশ কোন জবাব দিল না।

শর্মিলা বলে—এই এক বছরে তুমি অনেক বদলে গেছ বিকাশ।

—তোমার পরিবর্তনটাও কম নয় কিন্তু।

—তা হবে।

দরজায় কে যেন 'নক্' করল। বিকাশ বলে—ইয়েস, কাম ইন প্লিস্।

হোটেলের একজন কর্মচারী, তিন চার সেট পর্দার নমুনা এনে দাখিল করল বিকাশের সামনে। বিকাশ তার ভিতর একটা পছন্দ করে দিল। লোকটা সেলাম করে চলে যেতে শর্মিলা বললে—এ পর্দাগুলো তোমার পছন্দ হল না?

বিকাশ পাইপটা জ্বালতে জ্বালতে বলে—হলুদ রঙ আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

শর্মিলা বললে—আশ্চর্য! আমার কিন্তু বাসন্তীরঙ খুব ভাল লাগে।

বিকাশ শুধু বললে—ও!

আবার কয়েকটা নীরব মুহূর্ত।

হঠাৎ হাতঘড়ি দেখে বিকাশ বলে—কটার সময় তোমার ডিনারের নিমন্ত্রণ?

—ডিনার নয়, রাত্রে সামান্য খাওয়াদাওয়ার নিমন্ত্রণ। গেলেই হল।

—বাড়ি গিয়ে তারপর যাবে তো?

—তুমি বাড়িতে একটা ফোন করে দিলে সোজাই চলে যাই সেখানে।

—এই বেশে?

—কেন, বেশটা পছন্দসই নয়?

বিকাশ একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে—মাপ কর শমু, এ বেশে ঐ অন্ধদের মাঝে নেওয়া চলে, চক্ষুষ্মানদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া যায় না।

শর্মিলাও হেসে বলে—এবার কিন্তু হিসাবে তোমার একটু ভুল হল বিকাশ। তোমার ভাষায় 'লিগ্যাল সেপারেশন' না হওয়া পর্যন্ত আমার সামাজিক পরিচয় অন্ধ মাস্টারের বউ। তার পক্ষে এ পোশাক···

বাধা দিয়ে বিকাশ বলে ওঠে· ছিঃ শমু, এভাবে কেন নিলে কথাটাকে। আমি তো সে সেন্সে বলিনি।

- সেন্সে আছ তুমি তাহলে এখনও! যাক, এবার আমি চলি।

শর্মিলা উঠে দাঁড়ায়; বিকাশও উঠে পড়ে। বলে একটা কথা শমু, তুমি তো জানতে না যে, আমি হোটেলে উঠব। তোমার তো ধারণা ছিল আজ রাত্রে আমি তোমাদের বাড়িতেই থাকব, খাব। তবু তো তুমি সান্ধ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছ অন্যত্র?

শর্মিলা সে কথার জবাব দেয় না। হাতঘড়িটা দেখে বলে—কাল কি তুমি আসবে একবার আমাদের বাড়ি?

—যাব তো বটেই; তবে কখন যাব তা এখন বলতে পারছি না। তুমি কখন ফ্রি থাকবে?

—ফ্রি? ফ্রিডাম আগে পাই।

যাবার জন্যে শর্মিলা পা বাড়ায়।

—দাঁড়াও। একটা কথা। তোমার জন্য সামান্য একটি উপহার এনেছিলুম। সেটা দিই।

হাতব্যাগ খুলে একটা আংটি বার করে বিকাশ। সাদা পাথর বসানো একটা আংটি। পাথরটা পোকরাজ না হীরে! শর্মিলার ম্যানিকিওর করা অনামিকায় আংটিটা সযত্নে পরিয়ে দিতে যাবে, শর্মিলা ধীরে ধীরে হাতটা টেনে নেয়। বলে···তা হয় না বিকাশ।

বিকাশ একটু অবাক হয়ে বলে—হয় না? কেন?

শর্মিলা কী ভাবে জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

বিকাশ বলে কিন্তু খোঁপায় ফুল গুঁজে দেবার সময় তো তুমি আপত্তি করনি?

শর্মিলা ম্লান হেসে বললে—ফুল তো পাথরের মত ভারী নয়!

-- কিন্তু চিরস্থায়ী চিহ্ন তোমাকে দেবার অধিকার তো তুমি আমাকে চিঠিতে দিয়েছ শমু।

শর্মিলা গম্ভীর হয়ে বলে— চিঠিতে অধিকার দেওয়া যায় না বিকাশ, সম্মতি দেওয়া যায়। যে কারণে তুমি আজ আমাদের বাড়িতে উঠতে পর্যন্ত রাজী হলে না, সেই কারণে তোমার হাত থেকে এ উপহারও যে আমি নিতে পারি না, এটুকুও কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে?

লিফ্‌ট পর্যন্ত বিকাশ ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল, বললে— তুমি আমার উপর রাগ করে গেলে—

ওকে থামিয়ে দিয়ে শর্মিলা বলে—সেটাও তোমার ভুল ধারণা। রাগ আমি করিনি।

—রাগ না হলেও অভিমান ?

লিফ্‌ট-ম্যান দরজা খুলে প্রতীক্ষা করছে। শর্মিলা পা বাড়ায় সেদিকে। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—অভিমান! কিন্তু সেখানেও তোমার হিসাবে ভুল হয়েছে বিকাশ। লিগ্যালি তোমার উপর অভিমান করবার অধিকারই কি আমার আছে ছাই!

দড়াম করে লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পথে বেরিয়ে এসে শর্মিলার মনে হল সে অত্যন্ত ক্লান্ত, অবসন্ন। শারীরিক এবং মানসিক। খোঁয়াড়-ভাঙা মাতালের মতো পা যেন তার এখনও টলছে; ইচ্ছে হচ্ছে কিছুক্ষণ শুয়ে পড়ে থাকে কোথাও। তবু পায়ে পায়ে চলতে থাকে গড়ের মাঠের দিকে। চৌরঙ্গী দিয়ে জনস্রোত চলেছে দলে দলে, জোড়ায় জোড়ায়। আলো-ঝলমল রাজপথ। সুবেশ তরুণ-তরুণী, ক্যামেরা-কাঁধে বিদেশী ট্যুরিস্ট, অফিস-ফেরত বাসের-হাতল-লালায়িত কেরানিকুল, পার্কার কলমের আঁধার ব্যাপারী আর ব্যাঙোবাদক অন্ধ ভিখারী। চৌরঙ্গীর একটা জেব্রা অংশে ওপারে চলে এল ক্রমে। পান-বিড়ির পসরা, ফুচকাওয়ালা, ঝালচানার বেসাতি—তার মধ্যে পথ করে ও চলে এল সেনোটাফের দিকে। এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। অবনত-মস্তক সেপাইটার সামনে দাঁড়ালো একটুক্ষণ। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেনোটাফটার দিকে। পাথরের চাতালে বসল। ভাগ্য ভাল, এখানটায় বেশি লোকজন নেই এখন।

সমস্ত জীবনভোর সে কি শুধু ভুলই করে যাবে? জীবনযুদ্ধে তার ভূমিকা কি ঐ অবনতমস্তক বন্দুকধারী সৈনিকটির মতো? আনন্দকে সে একদিন ভালবেসে বিয়ে করেছিল—সেদিন সে সত্যই মুগ্ধ হয়েছিল একজন আত্মভোলা অধ্যাপকের অসহায়তায়, তার সারল্যে তার অমলিন-ভালবাসায়। ভেবেছিল প্রেম বিশ্বজয়ী, আর পাঁচটা জাগতিক অভাববোধকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারবে আনন্দের ভালবাসার বিনিময়ে। সেভাবেই মনকে প্রস্তুত করে একদিন গৃহত্যাগ করেছিল। আজ বুঝতে পারে, সেটা তার মর্মান্তিক ভুল! শর্মিলা প্রাচুর্যের ক্রোড়ে লালিত, সে শাড়ি-গহনা ভালবাসে, সাজতে ভালবাসে, সাজাতে ভালবাসে। কিন্তু আনন্দ ছিল ঠিক তার বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। তার নিজের জামা-কাপড়ও কখনও ধোপদুরস্ত থাকত না; আনন্দ কোনদিন ফিরেও দেখত না শর্মিলা কী পরে, কী ভাবে সাজে। কোনদিন শখ করে একখানা আটপৌরে শাড়ি অথবা একটা ঝুটো মুক্তোর মালা এনে বলেনি—এটাতে তোমাকে চমৎকার মানাবে। কোনদিন নূতনভাবে খোঁপা বাঁধলে, নূতন একখানা শাড়ি ভাঙলে তা নজরে আসত না আনন্দের—আচমকা কখনও বলে

বসত না—বাঃ!

আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই সেদিন ভুলই হয়েছিল শর্মিলার। মর্মান্তিক ভ্রান্তি।

কিন্তু চেষ্টার তো ত্রুটি ছিল না ওর। সামান্য আয়োজনেই গড়ে তুলতে চেয়েছিল সে তার ছোট্ট নীড়টিকে। তিল তিল করে সঞ্চয় করত সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণ, সংকুচিত করত অপব্যয়। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় জোড়া দিয়ে টেবিল-ঢাকা বানাত, ছেঁড়া বিছানার চাদর ছুপিয়ে জানালায় পর্দা দিত। ধোবার খরচ কমাতে ডান ডান কাপড় কাচত। যে জীবনের সঙ্গে পরিচয়ই ছিল না প্রাক্‌বিবাহ জীবনে সেই কৃচ্ছ্রতাকে শুধু সহ্য নয়, স্বীকার নয়, বরণ করে নিতে রাজী হয়েছিল শর্মিলা। সব কিছু কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য সেদিন সে ছিল প্রস্তুত। সংসারের অভাব মেটাতে সে চাকরি করতেও চেয়েছিল। মনে পড়ছে এই উপলক্ষ্যেই বেধেছিল সংঘাত।

ওরা তখনও হুগলীতে। সেদিন কী একটা ছুটি ছিল আনন্দ তার নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মে সকাল থেকেই বসেছে বাইরের ঘরে তার নথীপত্র নিয়ে। মৌর্যযুগের স্ত্রী-স্বাধীনতা না তুঘলকী আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থা কী নিয়ে যে ডুবে আছে আনন্দ, তা ঠিক জানা নেই। কৌতূহলও ক্রমশ মিটে আসছে শর্মিলার। আনন্দর পাণ্ডুলিপির উপর আজকাল আর নজর দেয় না সে। হঠাৎ শুনল বাইরের ঘরে আনন্দ কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। আড়ি পাতা ওর স্বভাব নয়, কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোকের উচ্চকণ্ঠস্বরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলাপচারিটা কানে গেল শর্মিলার। ভাষা এবং বক্তব্য এমন মধুর নয় যে, দুবার শুনবার ইচ্ছে করে। তবু ভিতরের জানলার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে।

ভদ্রলোক বিদায় হওয়ামাত্র ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে শর্মিলা বলে, লোকটা কে?

অপমানটা বুঝি তখনও ঠিকমতো পরিপাক করে উঠতে পারেনি আনন্দ। ঢোক গিলে বলে, বিশেষ কেউ নয়, আমার পরিচিত একজন পাবলিশার।

—ওঁর কাছ থেকে টাকা ধার করেছ তুমি?

আনন্দ জবাব দেয় না। অপরাধীর মতো কোঁচার খুঁটে চশমার কাচটা মুছতে থাকে।

—ছি ছি ছি। আর তাই লোকটা তোমাকে বাড়ি বয়ে অপমান করে গেল? কত টাকা ধার করেছিলে?

—চার শ'।

—কী করেছ সে টাকায়? খাইয়েছ আমাদের?

আনন্দ চকিত হয়ে বলে, উমি কোথায়?

শর্মিলা শ্লেষের সঙ্গে বলে, লোকলজ্জা বস্তুটা তাহলে আছে তোমার! ভয় নেই, তোমার পাবলিশার বন্ধু যেভাবে চেঁচিয়ে কথা বলেন, তাতে দু দিনেই পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে যাবে।

হাত থেকে বালা-জোড়া খুলে শর্মিলা রাখল ওর পাণ্ডুলিপির উপর। বললে, যাও, এ বালা-জোড়া বেচে ধার শোধ করে দিয়ে এস।

কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে রইল আনন্দ।

তার দিন দুয়েক পরেই খবরের কাগজের একটা কাটিং দেখিয়ে শর্মিলা বলে, ভাবছি এখানে একটা দরখাস্ত করে দিই।

আনন্দ গভীরভাবে ডুবে ছিল তার পাণ্ডুলিপিতে। সচরাচর এসব কথা একবারে তার কানে যায় না, কিন্তু সেদিন কি যেন হল, প্রথমবারেই কথাটা কানে গেল ওর। চোখ থেকে চশমাটা খুলে বললে, তার মানে? তুমি চাকরি নিতে চাইছ? কেন?

ভাল মুখেই জবাব দিয়েছিল শর্মিলা, দুজনের রোজগারে সংসারের অবস্থাটা আর একটু সচ্ছল হত। আমার বাবার দেওয়া গহনা তুমি সেদিন নিলে না, কিন্তু তাই বলে আমার উপার্জনের টাকা না নেবার কোন কারণ নেই।

আনন্দ বেদনাপাণ্ডুর মুখে বলে, এখনও তো তার প্রয়োজন হয়নি শমু।

একটু রুক্ষস্বরে শর্মিলা বলে, তুমি তাই মনে করছ, আমরা করছি না।

আনন্দ অভ্যাসমতো কোঁচার খুঁটে তার চশমার কাচটা সাফা করতে থাকে। প্রত্যুত্তর করে না। সে বোধ হয় এতদিনে বুঝতে পেরেছে কথা বললেই কথা বেড়ে যায়। কিন্তু কথা না বললেও যে কথা বাড়ে। শর্মিলা ধমকে ওঠে, কী, সব কথায় বোবার মতো তাকিয়ে থাক বল তো? এভাবে চলে নাকি তিনটে মানুষের সংসার!

আনন্দ গলাটা সাফা করে বলে, পরের মাস থেকে আর একটা ট্যুইশানি পাব। জগদীশবাবু দেবেন বলেছেন।

—ট্যুইশানি! অর্থাৎ আর পঁচিশটা টাকা! কিন্তু তাতেও কি এই নুন আনতে পান্তা ফুরানোর হিল্লে হবে কিছু?

আনন্দ শেষ চেষ্টা করে, আর তাছাড়া আমার লেখাটাও তো শেষ হয়ে এল। আর দিন সাতেকের মধ্যেই—

বাধা দিয়ে শর্মিলা বলে, থাক থাক। ও আলোচনা থাক। তুমি মনে কর সেদিন সেই পাবলিশার ভদ্রলোক কী বলে গেলেন তা শুনিনি আমি। আট আনা দিস্তে দরে কাগজ কিনে আট আনা সের দরে বেচতে হবে পুরানো খবরের কাগজওয়ালাকে।

একেবারে পাণ্ডুর হয়ে গেল আনন্দ। কথাটা বোধ করি তার মর্মমূলে বিঁধেছিল সেই দিন থেকেই। পাবলিশার ভদ্রলোক ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন

তাকে। এ বই কেউ ছাপতে রাজী হবে না। কে কিনবে?

আনন্দ আনত মুখে চুপ করে বসে থাকে।

শর্মিলার বোধ করি এতক্ষণে দয়া হয়। হাজার যাই হোক, লোকটা ঐ গ্রন্থটি লিখতে প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। ঠিক এ ভাষায় কথাটা বলা বোধ হয় উচিত হয়নি ওর। বলে, কিন্তু সেদিন সেই ভদ্রলোক তোমাকে আর একটা কি লিখতে বলছিলেন বল তো?

হঠাৎ শান্ত মানুষটা ক্ষেপে ওঠে একেবারে। ধ্যানস্তিমিত পর্বত যেন আগ্নেয়গিরি হয়ে ওঠে মুহূর্তে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বলে, সেটুকুও আড়ি পেতে শুনতে পারনি?

শর্মিলা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মানুষটা যে রাগতে জানে, তা যেন এই প্রথম জানল সে। কোন কথা না বলে হনহন করে বেরিয়ে গিয়েছিল আনন্দ

সেদিন না শুনলেও পরে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল শর্মিলা। আনন্দই বলেছিল তাকে। পাবলিশার ভদ্রলোক ওকে দিয়ে একটা ইতিহাসের প্রশ্ন-উত্তরের বই লিখিয়ে নিতে চান। বইয়ে অবশ্য লেখকের নাম থাকবে একজন বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপকের। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের খাতা দেখেন এবং যাঁর খানকয়েক চালু বই বাজারে আছে। সে ভদ্রলোকের লিখবার মতো সময় অথবা অধ্যবসায় নেই, তবে নামটা তিনি প্রকাশক মশাইকে কিঞ্চিৎ অর্থমূল্যে ধার দিতে পারেন।

আনন্দ বলেছিল, তুমিই বল, সে বই আমার লেখা উচিত?

ওর বুকে মুখ লুকিয়ে আশ্লেষনয়না শর্মিলা বলেছিল, তাই কি আমি বলতে পারি! আমিও তো মানুষ।

আনন্দ ওকে জড়িয়ে ধরেছিল সে উত্তরে। বলেছিল, আমি জানতুম তুমি কখনও আমাকে সে অপমানের মধ্যে টেনে নামাবে না। তাতে যত কষ্টই হোক। এ তো আমার শিক্ষার অপমান নয়—এ যে আমার আত্মার অপমান!

কিন্তু অর্থই সকল অনর্থের মূল। এ ক্ষণিক মিলন শাশ্বত হয়ে উঠতে পারেনি ওদের সংসারে। নিত্য অভাব মানুষকে স্বভাবতই খিটখিটে করে তোলে। শর্মিলা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সব অভাব, অনটনকে মানিয়ে নিতে কিন্তু দারিদ্র্যজনিত অপমানকে সে তখনও মেনে নিতে পারত না। মাঝে মাঝে মতান্তর ঘটত। আর মতান্তর থেকে মনান্তর খুব বেশি দূরের পথ নয়। দারিদ্র্য দৈত্যটার সঙ্গে লড়াই করতে আনন্দ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। একাদিক্রমে সে কাজ করে যায় উদয়াস্ত। আরও একটা ট্যুইশানি নিল সে। বাড়ি ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়। রাত্রে ক্লান্ত মানুষটার আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। আর্থিক সচ্ছলতা একটু হল বটে, কিন্তু আনন্দকে পুরোপুরি

হারালো শর্মিলা। ততদিন তবু রাতটা ছিল আনন্দ-মুখরিত— এরপর থেকে ঘুমন্ত মানুষটার পাশে নিরানন্দেই জাগররাত্রি কেটে যেত ওর।

ক্রমে শর্মিলার মনে হল অতি অল্প সময়েই সে বুঝি ফুরিয়ে গেল। মাত্র সাত আট মাস হল বিয়ে হয়েছে ওদের। দিনরাত্রিগুলি কোথায় ডানা মেলে উড়ে যাবে, তা নয় ধীর মন্থর গতিতে প্রহরগুলি এগিয়ে চলে— যেন স্টীম রোলারের গতিচ্ছন্দ। শর্মিলার মনে হল তার জীবন, তার যৌবন সবই আজ উপেক্ষিত হতে বসেছে। শুধু টাকার চিন্তায় মানুষটা সারাদিন ছোটাছুটি করে, রাত্রে ক্লান্তিতে ঘুমায়। বাড়িতে যে সদ্যবিবাহিত একটি তরুণী তার জন্য প্রতীক্ষা করে প্রহর গোণে এ কথাও যেন মনে থাকে না আত্মভোলা মানুষটার। কোথায় অনুশোচনা জাগবে, না উল্টে প্রচন্ড অভিমানে শর্মিলা রীতিমতো হিংস্র হয়ে ওঠে।

প্রায় এই সময়েই চোখের অসুখ হল আনন্দের। শর্মিলার নজরে পড়েনি। খেয়াল হল উমার কথায়। উমা বলছিল, তোমার চোখটা এত লাল হয় কেন দাদা?

আনন্দ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল ব্যাপারটা।

কিন্তু দু-চার দিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে অত সহজে পার পাওয়া যাবে না। উমার আগ্রহাতিশয্যে আনন্দ চোখ দেখাতে গেল। এতসব ব্যাপার কিছুই জানতে পারেনি শর্মিলা। সে সময় দিনান্তে ওদের স্বামী-স্ত্রীতে একটিও বাক্য বিনিময় হত কিনা সন্দেহ। জানতে পারল আনন্দের চোখে নতুন চশমা দেখে।

—চশমা পালটেছ দেখছি? একদিন বললে শর্মিলা।

আনন্দ শুধু বলে, হুঁ।

—পাওয়ার বেড়েছে বুঝি?

—সামান্য।

আর কিছু জানতে চায়নি শর্মিলা! কেনই বা চাইবে? আনন্দ কি কোনদিন জানতে চেয়েছে শর্মিলার কথা? তারও যে শরীর খারাপ, তারও যে আহারে রুচি নেই, একটা বিবমিষার তাড়নায় সে যে ছটফট করে ফেরে সারাদিন, তা কি আনন্দও জানতে চেয়েছে?

তাই সেদিন শর্মিলা জানতে পারেনি চোখের ডাক্তার কী সর্বনাশা সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন আনন্দকে। ওর চোখের শিরাগুলি নাকি শুকিয়ে যেতে বসেছে। চোখের পরিশ্রম একেবারে কমিয়ে না দিলে, বিশেষত কৃত্রিম আলোয় পড়াশুনা করা বন্ধ না করলে আনন্দ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ কথা সেদিন শর্মিলা জানেনি আর আনন্দ মানেনি। কিম্বা হয়তো জেনেশুনেই সে তা সত্ত্বেও সাবধান হয়নি। আজ শর্মিলা ভাবে, কেন? কী ক্ষতি হত যদি

আনন্দ সব কথা খুলে বলত শর্মিলাকে। হয়তো ওর রোগ তখনও ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের এক্তিয়ারের ভিতর। অত্যাচারের বদলে চিকিৎসা করালে হয়তো আনন্দের চোখের সামনে এভাবে মুছে যেত না পৃথিবীর আলো, কিন্তু, কেন সাবধান হয়নি আনন্দ? অভিমান? আত্মভোলা মানুষটার অনামনস্কতা? না আর কিছু?

আজ এত কথা ভাবছে শর্মিলা; কিন্তু সেদিন এত কথা ভাবত না। তখন সে নিজেও ছিল অসুস্থা। উমা ছেলেমানুষ, পরিবর্তনটা সে আন্দাজ করতে পারেনি। শর্মিলা ভাবত এ সময়ে কী করবে সে? বাবা-মা-দাদা একবারও খোঁজ নিতে এলেন না। রমু মাঝে মাঝে চিঠি লেখে বটে কিন্তু তাও যেন ভাসা ভাসা। বসুপরিবারের খাতায় খরচের অঙ্কে তার নাম লেখা হয়ে গেছে। আজ আর সে ওখানকার কেউ নয়। এই অবস্থায় সে কিছুতেই গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না মায়ের কাছে।

কিন্তু হাজার যাই হোন তিনি তো মা। মা হয়ে মেয়ের মাতৃত্বের বেদনা বুঝবেন না স্বাগতা? মাথা নিচু করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে ব্যবস্থা একটা হবেই। কিন্তু তাতে যে শর্মিলার মর্মান্তিক অপমান! বসুপরিবারের বড় আদরের মেয়ে সে। আকৈশোর যা চেয়েছে তাই পেয়েছে দু হাতের মুঠিতে। আর আজ সে এতটা পর হয়ে গেছে যে কেউ তার নামও উচ্চারণ করে না একবার! কী এমন অন্যায় করেছে সে? এর চেয়ে অনেক বড় কলঙ্কের কাজ করেও তো ওদের সমাজে অনেক মেয়ে সগৌরবে অধিষ্ঠিত। ব্যারিস্টার সেনের মেয়ে তার গানের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। সে তো ফিরে এসে দিব্যি আছে মায়ের কোলে! শর্মিলার অপরাধটা কি তার চেয়েও বেশী? না, শর্মিলা তা পারবে না—অন্যায় সে করেনি, অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে সে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বাসু-সাহেবের সেই প্রাসাদোপম বাড়ির পোর্টিকোর সামনে।

কিন্তু—

আনন্দের উপর ভরসা করা যায় কি? সে কিছুই জানেনা এখনও। জানলেও কতটুকুই বা সামর্থ্য তার? হয়তো কাউকে দিয়ে একবার ডাক্তার ডাকাবে। হয়তো স্থানীয় হাসপাতালের ফ্রি-বেডে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। অথবা হয়তো অনভিজ্ঞ ধাইয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করে জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলতে হবে শর্মিলাকে। যদি সে না বাঁচে? না না, মরতে সে চায় না। জীবনকে বড় ভালবাসে শর্মিলা। এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীর মায়া এখনও তার মজ্জায় মজ্জায়। শর্মিলা মরতে চায় না। কিন্তু শুধু তার মৃত্যুর কথাই তো উঠছে না; এমনও তো হতে পারে—সে বেঁচে উঠলো কিন্তু অনভিজ্ঞ গ্রাম্য ধাইয়ের হাতে বিধাতার প্রথম দানটিকে খোয়াতে

হল তাকে! শিউরে ওঠে শর্মিলা। অলক্ষণে কথাটাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে চায় মনের আঙিনা থেকে।

প্রায় এই সময়েই ওদের সংসারে এসেছিলেন একটি বিচিত্র জীব। কী একটা যোগের স্নানের উপলক্ষ্যে আনন্দের কে এক মামিমা এসে হাজির হলেন মালদহ থেকে। সঙ্গে এল মামাতো ভাই অরুণ। আনন্দের চেয়ে বয়সে ছোট প্রায় শর্মিলারই সমবয়সী। বউদির সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতায় ছেলেটি সর্বদাই হাসিখুশী। কিন্তু তার মা-জননীটি অন্য ধাতুতে গড়া। যোগের স্নান চুকলো, তবু সপুত্র মামিমা যুক্ত হয়েই রইলেন ওদের সংসারে।

ভদ্রমহিলার শুচিবায়ু আছে। সংসারের কুটোটি তিনি নাড়তে নারাজ। তা হোক। তাতে আপত্তি নেই শর্মিলার। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন. তিনি কেন গিয়ে ঢুকবেন ওদের হেঁসেলে। কিন্তু তা তো নয়। সকালে উঠেই তিনি একটা কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসবেন রান্নাঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দাটায়। যেখান থেকে সমস্ত ভিতর বাড়িটার উপর নজর রাখা চলে। রুদ্রাক্ষের মালাটা ঘোরাবেন হাতে আর ক্রমাগত লক্ষ্য করতে থাকবেন কে কোথায় কী করছে। পান থেকে চুন খসলেই ফোড়ন কাটবেন, ও আনন্দ, চৌকাঠের উপর বসলি কেন রে? চৌকাঠে বসলে বাপের ধার হয়; আর তোরই বা দোষ কি! অ বউমা, বলি অ বড়লোকের মেয়ে, একখান মোড়া কি পিঁড়ি দে যাও না।

রান্নাঘরের মধ্যে ভাতের ফ্যান গালছিল শমু। তার দুটি হাত জোড়া। সামনে বসে তরকারি কুটছে উমা। সে বলে, থাক্ বউদি, আমিই দিয়ে আসছি। চট করে উঠে যায় সে দাদাকে একটা মোড়া এনে দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠেন বৃদ্ধা, হ্যাঁ রে উমি। গেরস্ত বাড়ির মেয়ে তুই, এটুকুও শিখিসনি? আনাজ কুটতে কুটতে ঐভাবে উঠে যায়? কাত করে রাখ বঁটি।

কিন্তু উমা তো আর বাড়ির বউ নয়, মেয়ে। জবাব দেয়, আমি এখনই তো ফিরে এসে বসব বঁটিতে—এক মিনিটে আর কি হবে?

খিঁচিয়ে ওঠেন মামি, মুখে মুখে তক্ক করিস্ না উমি। ছেলেপিলের বাড়িতে—

উমা ততক্ষণে ফিরে গিয়ে বসেছে নিজের জায়গায়। হেসে বলে, ছেলেপিলে আবার তুমি কোথায় পেলে মামি? অরুণদা কি এখনও খোকা!

মামি গর্জে ওঠেন, খালি মুখে মুখে চোপা! বে হলে আদ্দিনে যে তোরও তিনটে ছেলে হত!

উমা তবু রাগ করে না। বলে, বে তো আর হয়নি।

হরিনামের মালাটা ঘন ঘন ঘোরাতে থাকেন মামি। আর গজগজ করতে

থাকেন নিজের মনে, কী সব ছেলেমেয়ে হচ্ছে আজকাল! খালি তক্ক আর তক্ক! আমাদের কালে এমনটি ছেলেনি!

এমনি নিত্য ত্রিশদিন। দু চার দিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছিল শর্মিলা। তবু মুখে কিছু বলেনি। দুদিনের অতিথি বৈ তো নয়। ওসব সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু আর কতদিন থাকবেন উনি?

আরও একটি কারণে মর্মাহত হয়েছিল সে। দুটি মাত্র ঘর। উমার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল শর্মিলাকে মামিমার সঙ্গে। আর বাইরের কামরায় আনন্দ রাত্রিবাস করত অরুণকে নিয়ে। এ ব্যবস্থাটায় আপত্তি করেছিল উমা; কিন্তু আনন্দ নিজেই এ ব্যবস্থাটা পাকা করল। শর্মিলার মনে হল এই আনন্দ বুঝি শর্মিলাকে এড়িয়ে যাবার একটা অজুহাত পেল। ঘরে আলো জ্বললে শর্মিলার ঘুম আসে না। সেটাও অবশ্য সত্যি কথা নয়। আলো জ্বললেও দিব্যি ঘুমাতে পারে সে; কিন্তু এ কথাটা আনন্দর কাছে স্বীকার করত না। শর্মিলার আর দোষ কি? বেচারির মাত্র কয়েকমাস হল বিয়ে হয়েছে। কোন্ লজ্জায় সত্যি কথাটা বলবে? ও একটু ঘুরিয়ে বলত, আলো জ্বললে আমার ঘুম আসে না, বাতি নিবিয়ে দাও।

ও জানে বাতি-নেভানো আঁধার ঘরের আবেষ্টনী ছাড়া ঐ বইপাগল মানুষটার নাগাল পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনটাই তো শর্মিলা আর আনন্দের মাঝখানে একসার ইতিহাসের বইয়ের আড়াল। রাত্রিটুকুও কি নিজস্ব করে পাওয়ার উপায় থাকবে না তার? ফলে বেশি রাত জেগে লেখাপড়া করার সুযোগ ছিল না আনন্দের। উপায় নেই, শর্মিলার চোখে আলো লাগে। এখন সে অসুবিধা নেই। অরুণের ওসব বালাই নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে পড়াশুনা করতে পারে আনন্দ। অরুণ তার বিছানায় মোষের মতো পড়ে পড়ে ঘুমায়। আর এ ঘরে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে শর্মিলা। ঘুমের বদলে চোখে নেমে আসে জল। এতদিন আলোয় তার ঘুমের ব্যাঘাত হত, এখন অন্ধকারই তার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকার! এ কী অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তার চারদিকে! আলোর দুলালী সে কি ভুল করে অন্ধকারে গলাতেই মালা দিয়েছে? আনন্দ কি তাহলে তাকে ভালবাসে না! সে কি ভুল বুঝেছিল! শর্মিলার সাহচর্য, সান্নিধ্য—এমন কি শুধুমাত্র দৈহিক সান্নিধ্যেরও কি আর প্রয়োজন নেই আনন্দের! জেগে জেগে সে লক্ষ্য করে পাশের ঘরে প্রহরের পর প্রহর আলো জ্বলতেই থাকে। দূরের পেটা ঘড়িতে এগিয়ে চলে রাত। রেলওয়ে সাইডিংএ মালগাড়ির এঞ্জিন মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; শান্টিং-এর কাজ চলতে থাকে। ঝনঝন করে গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা লাগে। আবার স্তব্ধ হয়ে যায় সব। প্রহরে প্রহরে ডাকে শেয়াল। রাত্রিচর চৌকিদারের হাঁকে চমকে ওঠে মাঝে মাঝে। মিউনিসিপ্যালিটির

একপায়ে-খাড়া, ল্যাম্পপোস্টের বাল্বটা ফিউস হয়ে গেছে। মশারির উপর এতদিন যে আলোর চক্রটা দেখা যেত সেটা মিলিয়ে গেছে। অমাবস্যা থাক আর না থাক, ওর ঘরে আজ নিত্য অমাবস্যা। একেবারে শেষ রাতের দিকে হঠাৎ নিবে যায় ও ঘরের আলো। আশ্চর্য, একদিনও কোন ছুতোয় আনন্দ এ ঘরে আসে না, অথবা ভিতরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় না ভুলে।

দুরন্ত অভিমানে শর্মিলা আরও সংকুচিত হয়ে যায়।

বোধ করি এই সময়েই ওর মনের সিস্মোগ্রাফে প্রথম ধরা পড়ে ভূকম্পন রেখা। ওর প্রথম মনে হয়—ও ভুল, করেছে। মারাত্মক ভুল। যে উপাদান থাকলে একটা মানুষকে নিয়ে একজন মেয়ে ঘর বাঁধতে পারে সেই মৌল উপাদানটাই নেই আনন্দের চরিত্রে। ও অনুভব করতে পারে ওর মনের বেদনার মূল উৎসটা কোথায়। অর্থনৈতিক অভাব অনটন নয়—আনন্দের চরিত্রের এই অভাবটাই তাকে সবচেয়ে পীড়িত করে। এইখানেই ভুল হয়েছে তার। বসুপরিবার থেকে চিরদিনের মতো বেরিয়ে আসার সময় সব দিকই ভেবে দেখেছিল শুধু এই কথাটা ভেবে দেখেনি, অভাব। অনটন, অনাহারের সঙ্গে লড়তে হবে এ কথা সে জানত,—মনকে সেজন্য তৈরী করেই এসেছিল—কিন্তু এ কথা ভাবেনি, যে অস্ত্রটার সাহায্যে ঐ দারিদ্র্য দৈত্যটার সঙ্গে লড়াই করবে সেই অস্ত্রটাই ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। শর্মিলা হারতে বসেছে—কিন্তু সে অভাব অনটনের কাছে নয়, সে পরাজয় আনন্দের নিষ্প্রেম উদাসীনতার কাছে।

আর কেউ না বুঝুক উমার নজর এড়ায়নি ব্যাপারটা। বউদির মানসিক পরিবর্তনটুকু তার নজরে এসেছিল। লক্ষ্য করেছিল, বউদি সারাদিনই যেন কী ভাবে; আনমনে থাকে। সেই বুঝতে পেরেছিল ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। তাই মাসখানেক কাটিয়ে মামি যখন যাবার সময় বললেন, উমিও চলুক, না কেন আমার সঙ্গে মালদ'য়, হ্যাঁরে আন্দ' ? হতভাগীটা তো কখনও কোথায় যাবার সুযোগ পায় না—তখন এক কথাতেই উমা রাজী হয়ে গেল। বোধ হয় সে ওদের দুজনকে বোঝাপড়া করে নেবার একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিল। তাই শর্মিলা যখন তাকে জনান্তিকে বললে, আমি যে একেবারে একলা পড়ে যাব ভাই ? তখন উমা হেসে বলেছিল, একেবারে একা তো নয়, দুজনে একা।

শর্মিলা ধমকে ওঠে, মুখে আর কিছু বাধে না, না ?

উমা মুখ টিপে হেসে বলে, বাধবে কোন দুঃখে ? বয়স তো কম হয়নি। বে হলে অ্যাদ্দিনে যে তিন ছেলের মা হতুম ! শুনলে না সেদিন ?

শমুও খিল খিল করে হেসে ওঠে। মামিমার নকল করে বলেছিল, খালি মুখে মুখে চোপা !

মনে মনে কিন্তু খুশী হয়েছিল শর্মিলা। সত্যিই সে একবার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় জীবনের। জেনে নিতে চায়, তার সমস্ত আকর্ষণীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কিনা। পরখ করে নিতে চায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ওর ক্লাসের রুটিন হাতে যে ছেলেটা ক্রমাগত পায়চারি করত সে এই আনন্দ কিনা।

যাবার আগে উমা ওকে আড়ালে ডেকে বললে, একটা কথা বলব বউদি?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে শর্মিলা বলে, কি কথা?

—কাল রাত্রে তুমি কলঘরে গিয়ে বমি করেছিলে, নয়?

শর্মিলা কী জবাব দেবে বুঝতে পারে না।

—আমি যা ভেবেছি, তা সত্যি, নয়?

এবারও শর্মিলা কোন কথা বলতে পারেনি।

আর উমা পাগলির মতো হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমো খেয়েছিল।

—এই যাঃ, কী হচ্ছে! ধমকে উঠেছিল সে।

—তাহলে আমার যাওয়া বন্ধ করে দিই, কেমন? দাদা জানে তো?

শর্মিলা আর গোপন করেনি কোন কথা। অনেক পরামর্শের পর ঠিক হয় উমা যাবে বটে তবে দিন পনের-কুড়ির মধ্যেই ফিরে আসবে। মামির উপস্থিতিতে খবরটা আর জানাজানি করে কাজ নেই। তারপর সুযোগমতো শর্মিলা আনন্দকে বলবে। উমা বারবার তাকে সাবধান করে দিয়ে যায়, শরীরের যত্ন নিতে, সাবধানে থাকতে।

আশ্চর্য! উমারা চলে যাবার পরেও আনন্দের দিক থেকে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না শর্মিলা। ওদের বিয়ের বছর ঘোরেনি। গত একমাস ওদের দিনগুলি ছিল মানুষজনের কোলাহলে আবিল, রাত্রিগুলি ছিল ইটের প্রাচীরে বিচ্ছেদিত। এ সত্যটা যেন মনেই নেই আনন্দের। দীর্ঘ একমাস বিচ্ছেদের পর প্রথম রাত্রিটার কথা স্পষ্ট মনে আছে শর্মিলার। বোধ হয় এতবড় আঘাত সে আর কখনও পায়নি বলেই।

সকালের গাড়িতে আনন্দ মামিমাদের ট্রেনে তুলে দিতে গেল। দুপুরের দিকে তার ক্লাস ছিল। ফলে স্টেশন থেকে সে কলেজে চলে যায়। অনেকদিন পর ফাঁকা বাড়িতে শর্মিলা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল যেন। জানলার পর্দাগুলো কাচতে নিল, বালিশের ওঁড়, বিছানার চাদর, সব। দুপুরে আর শুতেও গেল না। ঘরদোর সাফা করল বসে বসে। আনন্দকে চমকে দিতে হবে। বিকালের আগেই পালটে গেল ঘরের চেহারা। জানলায় ধপধপে পর্দা, বিছানায় পরিষ্কার চাদর, বালিশ-ঢাকা। রক্তকরবীর একটা গুচ্ছ তুলে এনে রাখল জল দিয়ে মাটির ফুলদানিটায়। বিকাল চারটে বাজে কি বাজে না গা ধুয়ে এল পুকুরে। প্রসাধন করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। শখের মধ্যে কেনে শুধু জবাকুসুম

তেলটা। এটা ওর চিরদিনের অভ্যাস। যতই ব্যয়সঙ্কোচ করুক অন্য কোনও তেল সে ব্যবহার করতে রাজি নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুল বাঁধল। একটু লজ্জা লজ্জা করছে তা হোক—সেই বিশেষ শাড়িখানাই বার করে পরল শেষ পর্যন্ত। বাসন্তী রঙের মুর্শিদাবাদী সিল্কটা। এটা দিয়েছিলেন ওকে বিয়েতে আনন্দের বাবার বৈমাত্রেয় ভাই—ওদের রতনদাদু! ফুলশয্যার রাত্রে এই শাড়িখানাই পরেছিল সে। উমা বলেছিল, ফুলশয্যায় বেনারসী পরতে হয়—সে কিন্তু তা শোনেনি। আনন্দ সেই বিশেষ রাত্রিটিতে ঐ শাড়িটিরও প্রশংসা করেছিল। সচরাচর শাড়ি গহনার দিকে তার নজর থাকে না—তবু বলেছিল, এ শাড়িখানাতে তোমাকে ভারী চমৎকার মানিয়েছে তো!

শুধু শাড়িই নয়, সাদা মুক্তোর মালাছড়াও বের করে পরল গলায়। এটা ড্যাডির দেওয়া। না, ওর বিয়েতে নয়,—ও ফার্স্ট ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ করার খবর পেয়ে ব্যারিস্টার বোস-সাহেব এ মালাছড়া উপহার দিয়েছিলেন শমুকে। এটা সে নিয়ে এসেছিল আসার সময়। বাবার দেওয়া স্মৃতিচিহ্ন। মনে আছে এই মালাটাও ছিল ওর গলায় সেই ফুলশয্যার অবাক রাত্রিটাতে।

সাজগোজ শেষ হলে শর্মিলা এসে দাঁড়ালো একবার আয়নার সামনে। বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু। একবার ভাবল, ছিঃ খুলে ফেলা যাক এ পোশাক; কিন্তু আবার মনে হল, থাক না!

বাসন মেজে দিয়ে ঝি চলে গেছে। শর্মিলা একাই বসে আছে বাড়িতে। সন্ধ্যা হব হব। আচ্ছা, আনন্দটা কী! আজকের দিনেও একটু সকাল সকাল বাড়ি আসতে পারে না! কলেজ ছুটি হয়ে গেছে তো সেই চারটেয়। কী করছে সে এতক্ষণ!

একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকে; কি মন বসে না বইতে। কানটা খাড়া আছে কখন সদর দোরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তিল তিল করে কেটে যায় সময়; ঘনিয়ে আসে রাত। শর্মিলা উনুনে আগুন দেয়—রান্না চড়ায়। ক্রমে রান্নার কাজও শেষ হল তার। লোকজনের চলাফেরাও কমে এল পথে। শেষে রাত সাড়ে নটা নাগাদ ফিরে এল আনন্দ। ততক্ষণে শর্মিলার মনের সবটুকু রসকষই শুকিয়ে যাবার উপক্রম।

—এত দেরী হল যে?

—কলকাতায় গিয়েছিলাম একটু।

—কলকাতায়! হঠাৎ?

—ন্যাশনাল লাইবেরী থেকে একখানা বই আনতে।

—ও!

—চল, খেয়ে নিই গে।

শর্মিলা আর কোন কথা বলে না। রান্নাঘরে এসে ভাত বেড়ে দেয়। আনন্দ মুখ হাত ধুয়ে এসে খেতে বসে। আহারান্তে আনন্দ উঠে যায় শোবার ঘরে। আশ্চর্য, একবারও সে তাকিয়ে দেখে না ঘরখানার দিকে। অথবা ঘরণীর দিকে।

দাঁতে দাঁত দিয়ে যা হোক দুটি খেয়ে নিয়ে শর্মিলা যখন শুতে এল তখনই ঘটল চরম দুর্ঘটনা। আনন্দ বললে, আলো জ্বললে তো আবার তোমার ঘুম আসবে না—আমি তবে ও ঘরে গিয়ে বসি?

শর্মিলার ইচ্ছে হল ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দের উপর। আঁচড়ে কামড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। সে কিন্তু সে ইচ্ছাকে দমন করে শেষ পর্যন্ত। অনেক কষ্টে অশ্রু গোপন করে বলে, আজ রাত্রেও তুমি লিখবে?

—না, লিখব না, পড়ব। এই বইখানা—

—বুঝেছি। থাক, ও ঘরে যেতে হবে না। এ ঘরেই পড়; আলোতে আমার অসুবিধে হবে না।

—ও আচ্ছা। বইখানা নিয়ে আনন্দ গিয়ে বসে টেবিলে।

শর্মিলা চুপ করে বসে থাকে খাটের উপর। দু মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, আনন্দ তন্ময় হয়ে বই পড়ছে ততক্ষণ। শর্মিলা ওঠে। টেবিলটা গোছায়। আলনার কাপড়গুলো নামায় আবার কুঁচিয়ে রাখে। আনন্দ নির্বিকার। বইয়ের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছে। শেষ পর্যন্ত শর্মিলা কি জানি কেন হঠাৎ বলে বসে, তুমি একটু ও ঘরে যাবে, আমি কাপড়টা ছেড়ে নিতাম। এবার শোব তো।

—অ্যাঁ! ও, আচ্ছা আচ্ছা।—বইখানা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আনন্দ চলে যায় পাশের ঘরে। না গিয়ে উপায় কি? এ ঘরে যখন একজন ভদ্রমহিলা কাপড় পালটাতে চাইছেন তখন তাকে শালীনতার খাতিরে স্থানত্যাগ করতেই হয়।

আলো জ্বলল ওঘরে। আর এ ঘরে চুপচাপ পড়ে রইল শর্মিলা, তার ভরা যৌবনের পসরা সাজিয়ে। এক পায়ে খাড়া মিউনিসিপ্যালিটির বাল্বহীন পোস্টটা অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্রিচর পাহারাওয়ালার হাঁকে চমকে ওঠে একবার। পেটা ঘড়িতে বেজে যায় বারোটা, একটা, দুটো। সদ্য কাচা ধপধপে বালিশের ওড়টা ভিজে যায়, শর্মিলা বাথরুমে উঠে যায়। গায়ের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তার।

শর্মিলা ভেবেছিল ওরা চলে গেলে এই দুজনে-একার সংসারে বুঝি ফিরে আসবে ওদের সেই হারানো দিনগুলোর মেঘ-রৌদ্রের খেলা। নূতন করে আবিষ্কার করবে সে নিজেকে আনন্দের মুগ্ধ দৃষ্টির আরশিতে। আনন্দ আনমনা, উদাসীন—এ কথা জানা ছিল;—কিন্তু সে তো এমন ছিল না। শর্মিলার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিল, তাকে দেখবার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলবার

জন্য সে যে এক সময় ছটফট করত এ তো মিথ্যা নয়। মেয়েদের সাজসজ্জা সম্বন্ধে সে সাধারণত অন্যমনস্ক : কিন্তু শর্মিলার গলার এই মুক্তোর মালাটাতে তাকে যে ভাল মানায়, এই বাসন্তী রঙের শাড়িতে তাকে যে আরও সুন্দর দেখায় এসব কথা তো শর্মিলা আনন্দের মুখেই শুনেছে। তাহলে ওর সেসব অনুভূতি, সেই মন কোথায় গেল ? আনন্দের দিক থেকে কোন সাড়া জাগল না বাড়ি খালি হয়ে যাবার পরও। শর্মিলা অন্তরের নিরুদ্ধ রোষে ফুলতে থাকে। সে হেরে গেছে, হারিয়ে যেতে বসেছে। নিজেকে আর সামলাতে পারে না। সোজা কথাগুলোও বাঁকা বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। গত মাসে সংসার খরচ বেশি হয়েছে মাস কাবার হবার আগেই আবার তাকে হাত পাততে হল আনন্দের কাছে। আনন্দের পক্ষে বিব্রত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। কোথায় সে বুঝবার চেষ্টা করবে আনন্দের ব্যথা, তা নয়, খিঁচিয়ে ওঠে একেবারে, খরচের সম্বন্ধে যদি এত ভয় তাহলে মামিকে আসতে বারণ করনি কেন ·

আনন্দ থতমত খেয়ে বললে, সে কথা নয়, আমি বলছিলুম কি দুশো টাকাই কি খরচ হয়ে গেছে একেবারে ?

—না তো কি মিছে কথা বলছি আমি ? কী ভাব তুমি ? সংসার খরচের টাকা থেকে মাসে মাসে বাপের বাড়ি মনি অর্ডার করছি ?

বেদনাতুর দুটি চোখ তুলে আনন্দ বলে, ছি শমু ! তুমি আমাকে অপমান করতে গিয়ে নিজেই ছোট হয়ে যাচ্ছ, তা বোঝ না ?

—কী, তুমি আমাকে ছোটলোক বললে ?

আনন্দ জবাব দেয় না। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ার উদ্‌যোগ করে। শর্মিলা বলে, যাচ্ছ কোথায় ? বিরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লে নাকি ?

চৌকাঠের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দ, ঘুরে কিছু বলতে যায়। তারপর সামলে নিয়ে বলে, না। কিছু ধার করে আনতে যাচ্ছি। হাতে এখন কিছুই নেই।

—আবার ধার ! কেন, সেদিন সে ভদ্রলোক যে অপমান করে গেলেন তাতে বুঝি তৃপ্তি হয়নি তোমার ? কার কাছে যাবে ? কাবুলীওয়ালার সন্ধান পেয়েছ নাকি ?

আনন্দ আর দাঁড়ায় না। চলে যায় বেরিয়ে।

ও চলে গেলেই শর্মিলা উবুড় হয়ে পড়ে বালিশের উপর। কেন সে বলতে গেল এ কথাগুলো ? মানুষটা যে কী অপরিসীম পরিশ্রম করছে তা কি শর্মিলা দেখতে পায় না ? নিজের জ্বালায় যে জ্বলে মরছে তার গায়ে এভাবে নুনের ছিটে দিয়ে কী লাভ ? ঈশ্বর জানেন এ সব কটু কথা বলতে চায় না শর্মিলা। সে পুরোপুরি ভাগ নিতে চায় আনন্দের দুঃখের, বেদনার, তার অসহায়ত্বের। কিন্তু আনন্দ কেন তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ? কেন তাকে অপমান করছে

এভাবে ? অপমান বইকি ! তার ভালবাসাকে. তার নারীত্বকে, তার যৌবনকে অপমান করেছে আনন্দ।

ভাব করবার জন্যে, মিটিয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে শর্মিলা, কিন্তু কোথায় কী যে হত, কিছুতেই মিলত না আর। ভাঙা চীনে মাটির পাত্র যেন। দাগে দাগে মিলিয়ে দাও, জোড়ার দাগ দেখা যাবে না ; কিন্তু যেই সে পাত্রে জীবনের রস ঢালতে যাবে, অমনি দেখবে ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অমৃতধারা। পাত্রে ধরা পড়ছে না কিছুই।

মনে আছে সেদিন সন্ধ্যার কথা। টাকার ধান্দার সারারাজা ঘুরে ঘণ্টা চারেক পরে ফিরে এসেছিল আনন্দ। রোদে রোদে ঘুরেই মুখটা লাল হয়েছে, না উত্তমর্ণের কাছে কিছু মিষ্টিমধুর সম্ভাষণ শুনে অপমানে লাল হয়েছে বুঝতে পারে না শর্মিলা। ফিরে এসে ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েছিল ক্লান্ত মানুষটা। ইতিমধ্যে রাগ পড়ে গিয়েছিল শর্মিলার। সে জানত আনন্দের ফিরতে দেরী হবে। অনেক জায়গাতেই সে ধার করেছে। মাসের এ চতুর্থ সপ্তাহে সহজে সে টাকার যোগাড় করতে পারবে না। তাই মিছরির একটা ডেলা ভিজিয়ে রেখেছিল। পাতিলেবুর রস দিয়ে এক গ্লাস সরবৎ তৈরি করে তালপাতাটা হাতে নিয়ে শর্মিলা এসে দাঁড়ায় ওর ইজিচেয়ারের সামনে। হাতটা চোখের উপর দিয়ে চুপ করে শুয়েছিল আনন্দ। শর্মিলা যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিশ্চয় টের পায়, কিন্তু চোখের উপর থেকে হাতটা সরায় না। শর্মিলা ওর পাঞ্জাবির বোতামগুলো একে একে খুলে দেয়। আনন্দ আপত্তি করে না।

—ছাতাটা নিয়ে বের হলেই পারতে। এঃ, একেবারে ঘামে ভিজে গেছ !

ঘন ঘন পাখাটা নাড়তে থাকে। নিঃসাড়ে আনন্দ পড়ে থাকে একই ভাবে।

—নাও, এটা খেয়ে নাও।

চোখ থেকে হাতটা সরিয়ে এবার বলে, কী ওটা ?

—সরবৎ।

—থাক, তার প্রয়োজন নেই। তেষ্টা পায়নি আমার।

—পেয়েছে। আর না পেয়ে থাকে নেই ; একটু হেসে বলে, উপরোধে মানুষে ঢেঁকি গেলে, আর এ তো এক গ্লাস জল।

তবু আনন্দ হাতটা বাড়ায় না। পকেট থেকে একগুচ্ছ নোট বার করে বলে, নাও, ধর।

শর্মিলা টাকাটা নেয়। একটু অবাক হয়। দশখানা দশ টাকার নোট। এত টাকা কোথা থেকে আনল আনন্দ ? কিন্তু এখন সে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। পরে সুযোগমতো জেনে নিলেই হবে। বলে, নাও, তুমি এটা ধর।

—বললাম তো তেষ্টা পায়নি।

—আমিও তো বললাম, না পেলেও খেতে হবে তোমাকে।

আনন্দ উঠে পড়ে। চৌকির উপর গিয়ে শোয়। বলে, কেন বিরক্ত করছ আমাকে? আমি আজ বড় ক্লান্ত। আমাকে রেহাই দাও।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে শোয় সে।

রাগে অপমানে শর্মিলা মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। আছড়ে ভেঙে ফেলে সে সরবতের গ্লাসটা। নোটগুলো ছুঁড়ে দেয় আনন্দের দিকে। চেঁচিয়ে ওঠে, মনে করেছ একশো টাকা আমি একসঙ্গে কখনও চোখে দেখিনি না? একেবারে কিনে ফেলেছ আমাকে?

আনন্দ উঠে বসে।

—প্রতিপালন করবার ক্ষমতা যার নেই, তার বিয়ে করার শখ কেন?

ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঘর ছেড়ে। পাশের ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু আবার নিজেই শান্ত হয়। এ কোনও সমাধান নয়। পাশের ঘরে ছিটানো পড়ে আছে কাচের টুকরো, নোটের বাণ্ডিল। আধঘণ্টাখানেক পর মুখ-চোখ মুছে আবার উঠে আসে এ ঘরে। দেখে মেঝেতে একটিও কাচের টুকরো নেই। নোটগুলিও গুছিয়ে রেখেছে আনন্দ আলমারির ড্রয়ারে। কখন নিঃশব্দে আবার বেরিয়ে গেছে ক্লান্ত মানুষটা চটিটা পায়ে গলিয়ে।

বারে বারে শর্মিলা চেষ্টা করেছে সহজ হতে, রাগ চাপতে, কিন্তু পারেনি। আনন্দও যদি প্রতিবাদে আঘাত করত ওকে, তাহলে সে খুশী হত। এত যে সে অপমান করে, আনন্দ কি ক্ষেপে যেতে পারে না? একেবারে আত্মহারা হয়ে আঘাত করে বসতে পারে না শর্মিলাকে? তাহলেও তো একটা সুরাহা হয়। তাহলে অন্তত অনুশোচনায় ভেঙে পড়বে আনন্দ। আদরে সোহাগে শর্মিলাকে করে তুলবে ক্ষমামুখর! কিন্তু তার কোন লক্ষণই নেই। মানুষটা যেন পাথর অথবা ভারবাহী একটা মোষ। মার খায় তবু টেনে চলে সংসারের এই মন্থরগতি গেয়ান। একবারও প্রতিবাদ করে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ খুলেছিল একদিন আনন্দ।

সেদিনটার কথাও স্পষ্ট মনে আছে ওর। ঐ ঘটনার দিন কতক পরে।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করে আনন্দ রাত্রি দশটার সময় যখন ফিরে এল তখন ওর মুখচোখ দেখে করুণা হয়; কিন্তু আশ্চর্য, করুণার বদলে প্রচণ্ড রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইল শর্মিলা। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, রাতের এ ট্রাইশানিটা ছেড়ে দাও তুমি।

আনন্দ জবাব দেয় না। পাঞ্জাবিটা ঝুলিয়ে রাখে হ্যাঙারে।

—জবাব দিলে না যে?

—কী জবাব দেব ? তুমি জানোই, তা সত্ত্বেও নুন-আনতে-পান্তা ফুরোচ্ছে।

ঝন্ করে ওঠে মাথার মধ্যে। তবু বলে, আমার সেই একদিনের মুখ ফস্কে বলা কথাটাই তুমি মনে রেখেছ দেখছি।

আনন্দ হেসে বলে, হ্যাঁ, স্মৃতিশক্তিটা অন্তত আমার ভালই।

সে হাসি দেখে জ্বলে উঠেছিল শর্মিলা, তা জানি। আমি ভাবতুম যে, শুধু সাল-তারিখ মুখস্থ করতেই বুঝি সে স্মৃতিশক্তি ফুরিয়ে গেছে তোমার। নইলে এ কথা কি মনে নেই, ডাক্তারবাবু তোমাকে রাত জেগে কাজ করতে বারণ করেছেন ?

আনন্দ চকিত হয়ে বললে, কে বলেছে তোমাকে ?

শর্মিলা বলে না যে যাবার আগে উমাই বলে গেছে তাকে। সে শুধু বলে, আমাকে কে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, তোমাকে যিনি বলেছেন তিনি চোখের ডাক্তার।

আনন্দ জবাব দেয় না। নিঃশব্দে তার পাণ্ডুলিপি পেড়ে নামায় তাক থেকে।

শর্মিলা ছিনিয়ে নেয় খাতাপত্রগুলো। বলে, কী ভেবেছ তুমি ? এ ভাবে অন্ধ হয়ে শাস্তি দেবে আমাকে ?

আনন্দ যথারীতি চোখ থেকে চশমাটা খুলে মুছতে থাকে। জবাব দেয় না। ওর নীরবতায় আরও ক্ষেপে যায় শর্মিলা। বলে, মনেও ভেব না, তাহলে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসব আমি।

চশমাটা চোখে বসিয়ে ম্লান হেসে আনন্দ বলেছিল, জানি, কাগজে পড়েছি।

প্রথমটা বুঝতে পারেনি শর্মিলা। তাই অবাক হয়ে বলেছিল, কাগজে পড়েছ ! কী পড়েছ কাগজে ?

—হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে গেছে। অন্ধ স্বামীকে ডিভোর্স করা চলে।

আর নিজেকে সামলাতে পারেনি শমু। রাগে দুঃখে অভিমানে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরেছিল আনন্দকে। বলেছিল, তুমি ইতর, তুমি—

কথাটা তার শেষ হয়নি। আনন্দ টাল সামলাতে না পেরে ধাক্কা খেয়েছিল মশারির ছাত্রর সঙ্গে। কপালটা কেটে যায় তার। রক্ত ফুটে ওঠে ওর কপালে।

মুহূর্তে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল শর্মিলা। এভাবে যে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাতে পারে, বস্তির মেয়েছেলের মতো দৈহিক আঘাত করে বসতে পারে তা যে তার স্বপ্নেরও অগোচর। ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় সে মরমে মরে গিয়েছিল। সম্মোহিতের মতো আঁচলটা দিয়ে চেপে ধরতে গিয়েছিল ক্ষতস্থান, কিন্তু প্রচণ্ড ঘৃণায় আনন্দ তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, থাক শর্মিলা। ওতে আমার ভাঙা কপাল জোড়া লাগবে না ; গরিবের ছেলের ঘোড়া রোগের এ মাসুলটুকু

আমার প্রাপ্য।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল শর্মিলা। আনন্দ নিজেই উঠে কলঘরে গিয়ে মুখটা ধুয়ে এসেছিল। ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল আর কথা না বাড়িয়ে। অনেকক্ষণ দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদেছিল শর্মিলা। তারপর সব অভিমান, সব অপমান ঝেড়ে ফেলে ডাকতে গিয়েছিল আনন্দকে। কারও তখনও রাতের খাওয়া হয়নি। গিয়ে দেখেছিল পাশের ঘরের অর্গল বন্ধ।

শর্মিলা সারারাত কেঁদেছে। দুরন্ত অভিমানী সে, তবু সব অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বারে বারে ডেকেছে দরজার এ প্রান্তে বসে। ফল হয়নি। ঠিক তেমনি করেই হেঁকে গেছে রাত্রিচর পাহারাওয়ালা, প্রহরে প্রহরে যামঘোষকের কান্নার হাহাকারে নৈশ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেছে। থানার পেটাঘড়িতে গড়িয়ে গেছে জাগর রাত্রি। তারপর চৌকাঠের উপরে কখন ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছে শর্মিলা।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। ছুটির দিন। রাত্রের ভাত ধরাই আছে। শর্মিলার আজ রান্নার হাঙ্গামা কম। জল দিয়ে রেখেছিল ভাতে। ভেবেছিল বেলা হলে শুধু আনন্দকে দুমুঠো ফুটিয়ে দেবে। ডাল তরকারি গরম করে নিয়েছিল। নষ্ট হয়নি কিছু।

সকাল থেকে আনন্দ নিজের খাতাপত্র নিয়ে বসেছে। কাল রাত্রে যেটুকু ফাঁক গেছে সেটুকু বোধ করি পুষিয়ে নিতে চায় সে। ঠিকে ঝিটা কামাই করেছে। চায়ের বাসনগুলি ধুয়ে দু কাপ চা তৈরী করল শর্মিলা। একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে চা খাওয়ার যুগ গেছে। যাবে না? কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে ওদের, কত যুগ আগে! চায়ের কাপটা ওর সামনে নামিয়ে রেখে শর্মিলা ফিরে আসে রান্নাঘরে। মন্থর গতিতে এগিয়ে যায় বেলা। আনন্দ স্নান সেরে আসে। ভাত বেড়ে শর্মিলা ডাকে। নিঃশব্দে আহারাদি সেরে আনন্দ আবার উঠে যায় ঘরে। শর্মিলা ভাবে সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে সেও গিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়বে ওর পাশে। আজ আর বাসন্তী রঙের মুর্শিদাবাদী সিল্ক নয়, সাদা মুক্তোর মালা নয়—আজ তার অন্য সাজ: আটপৌরে আর সাধারণ। বাইরের সম্পদ নয়, অন্তরের সম্পদ দিয়ে জয় করে নেবে আনন্দকে। রূপে আর ভোলাবার চেষ্টা নয়, ভালবাসায় ভোলাতে হবে। ক্ষমা চেয়ে নেবে অকুণ্ঠ ভাষায়। এই সুযোগ। আজকের এই ছুটির দুপুরে সে তার রঙের টেক্কাখানা খেলে দেখবে, পিঠ পায় কিনা! আনন্দের বুকে মুখ লুকিয়ে বলবে—কাল রাতে নিজেও রাগ করে খেলে না, আমাকেও খেতে দিলে না।

আনন্দ বলবে—পান্তা ভাতগুলো একা একা খেলে কেন? আমাকেও দিলে পারতে।

শর্মিলা বলবে—তুমি কি দুঃখে খেতে যাবে? তেঁতুল গোলা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেতে আমার যে সাধ হয়েছিল।

আনন্দ ঠোঁট উলটে বলবে—বলিহারি তোমার সাধ!

আর শর্মিলা বলবে—মেয়েদের সাধের কথা তুমি কী জানবে?

কেন জানব না?

আচ্ছা বল তো, মেয়েদের কখন এমন উদ্‌ভুটে শখ হয়?

বোকার মতো তাকিয়ে থাকবে আনন্দ। শর্মিলা ওর গালটা টিপে দিয়ে বলবে অধ্যাপক না হাতি! তুমি একটি বোকার রাজা! তারপর কানে কানে বলবে সেই বিস্ময়কর সংবাদটি সেই টেক্কার তুরুপ!

আনন্দ নিশ্চয় আত্মহারা হয়ে যাবে। চুমায় চুমায় বিপর্যস্ত করে তুলবে শমুকে। আর আনন্দঘন আশ্লেষশয়না শমু মৃদু প্রতিবাদ করে বলবে—অ্যাই! কী হচ্ছে অসভ্য! ওদিকের জানলাটা খোলা আছে না!

হায় রে দুরাশা! বাস্তবে এসব কিছুই হয়নি কিন্তু।

জল-দেওয়া পান্তাভাত একটা এনামেলের থালায় বেড়ে নিয়ে শর্মিলা সবে খেতে বসেছে রান্নাঘরে; হঠাৎ বাইরের ঘরে অনেকগুলি মিলিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে ওঠে। সামলে নিতে নিতেই হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে ওরা। পাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রমু আর বাদল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় শর্মিলা।

রান্নাঘরে চৌকাঠের ফ্রেমে যেন একখানা ছবি। মাইশোর জর্জেট শাড়িখানা পাকিয়ে পাকিয়ে ধরেছে রমলার দেহকে। এক হাতে রিস্টওয়াচ, অপর হাতে একসার কাচের চুড়ি। বাদলের হাতে প্রকাণ্ড একটা প্যাকেট। দ্বারিকের সন্দেশ। শর্মিলার চোখে আর পলক পড়ে না।

রমলার চোখেও লেগেছে বিস্ময়ের ঘোর। প্রায়ান্ধকার একটি ঘরে কাঁধতোলা এনামেলের থালায় একরাশ পান্তাভাত নিয়ে কাঁঠাল কাঠের ছোট্ট পিঁড়িতে লালপাড় মিলের শাড়িপরা ওই মেয়েটি কে! এই কি সেই লরেটো-লালিতা তার দিদি!

শর্মিলাই প্রথমে সামলে নেয় নিজেকে; বলে—নে, পথ ছাড়, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

হঠাৎ গলাটা ধরে যায় রমলার। গলাটা সাফা করে নিয়ে বলে, ঐ তো পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা-ভাত খাচ্ছিস; তাও আমাদের অত্যাচারে আধপেটা থাকবি? নে নে, তোকে আর কুটুম্বিতা করতে হবে না। খেয়ে নে ভাত কটা। আমি বসছি।

কিন্তু তাই কি পারে শমু? কোথাও কিছু নেই হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল সে। সে কি রাগে, অপমানে, দুঃখে? না কি দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জন মিলনের

আনন্দে ?

রমলা তো অপ্রস্তুতের একশেষ।

বাইরের ঘরে নয়। শোবার ঘরেই এনে বসিয়েছিল ওদের। অপরেশ যেন অতি মাত্রায় স্বাভাবিক হতে চায়। যা দেখে তারই প্রশংসা করতে থাকে।—বাঃ! কী সুন্দর ছোট্ট বাড়িখানা! ওটা বুঝি লতানে জুঁই? ভারি সুন্দর তো। এ টেবিল-ঢাকাটা বুঝি তুই তৈরি করেছিস শমু? প্যাটার্নটা গ্রান্ড। ও ফুলদানিটা তো ভারি বিউটিফুল!

শর্মিলা লজ্জা পায়। এতটা বাড়াবাড়ি দাদা না করলেও পারত। বুঝতে অসুবিধা হয় না গরিব ভগনীপতির উপর এ তার অকারণ দাক্ষিণ্য। আর এমন নির্বোধ আনন্দ, কোথায় সে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবে, তা নয় সব কথাতেই সে খুশীয়াল হয়ে ওঠে। আগ্রহভরে বোঝাতে থাকে—না, ওটা লতানে জুঁই নয়, মাধবীলতা। আজ্ঞে না, টেবিল-ঢাকাটা উমা তৈরি করেছে। উমা ওর ছোট বোন। না, সে এখন এখানে নেই। ফুলদানিটা? ওটা একটি মূকবধির ছেলের তৈরী। ওর একজন মাস্টার-মশায়ের একটি আশ্রম আছে। বিকলাঙ্গদের প্রতিষ্ঠান। ওটা মাস্টার-মশাই তাকে উপহার দিয়েছেন।

শর্মিলা মরমে মরে যায়। শান্ত সরল মানুষটার এটুকু বুদ্ধি নেই যে বুঝতে পারবে অপরেশ মনে মনে হাসছে।

অপরেশ, রমলা আর বাদল এসেছিল ওদের নিমন্ত্রণ করতে। অপরেশ বিয়ে করছে। সামনের বাইশ তারিখ। বড় ছেলের বিয়ে, তাই বড় মেয়েকে ক্ষমা করেছেন স্বাগতা। মেয়েজামাইকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছেন ওদের। রমুকে আড়ালে নিয়ে এসে সব কথা শোনে শর্মিলা। মেয়েটির নাম সরমা; —না, সোসাইটির মেয়ে নয়, শর্মিলা চিনতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, পূর্বরাগের কিছুটা পাঠ নিতে হয়েছে অপরেশকে। সরমা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, তার বাবা অপরেশের একজন বন্ধুর হেড ক্লার্ক। ভালবেসেই বিয়ে করছে অপরেশ। স্বাগতার ঘোরতর আপত্তি ছিল প্রথমটায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছেন। রমলা বলে, ঠেকে শিখেছে মা, বুঝেছে প্রেমের বন্যাকে বাঁধ দিয়ে রোখা যায় না। কার সাধ্য রোধে তার গতি।

শর্মিলা হাসে ওর ভঙ্গিমায়।

গল্পগুজবে বেশ মশগুল হয়ে ওঠে সবাই। শেষ পর্যন্ত শর্মিলা আনন্দকে আড়ালে ডাকে। নিম্নস্বরে বলে, ঝি আজ আসেনি। যাও, চট করে কিছু মিষ্টি নিয়ে এস মোড়ের দোকান থেকে।

আনন্দ অবাক হয়ে বলে, কেন? ওঁরাই তো একগাদা মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। তাই থেকেই দাও না।

চোখ ফেটে জল আসে শর্মিলার। ওর মনে পড়ে না এই মানুষটাই প্রথম আলাপে ওর হাতখানা টেনে নিয়ে বলেছিল, এই দেখুন আমার গায়েও কেমন রোমাঞ্চ হয়েছে! ওর মনে হল লোকটা কৃপণ! হাড় কিপ্পন! দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, যা বলছি শোন। ও মিষ্টি ওদের দেওয়া যায় না।

—কেন যায় না? এ তোমার রাধুময়রার চেয়ে হাজার গুণ ভাল মিষ্টি।

ঘরের ভিতর থেকে অপরেশ শুনতে পায় আনন্দের কথা। দোষ অপরেশের নয়, আনন্দ মোটেই নিম্নস্বরে বলেনি তার বক্তব্য। অপরেশ বেরিয়ে আসে বাইরে। বলে, কী পাগলামি করছিস শমু। এই ভরদুপুর বেলা আবার কেন মিষ্টি আনতে পাঠাচ্ছিস?

আনন্দ বলে, এখানে ভাল মিষ্টি পাওয়াও যায় না, দাদা। আর তা ছাড়া আপনিই তো নিয়ে এসেছেন এককাঁড়ি মিষ্টি!

যত যাই হোক অপরেশ এ যুক্তিতে সায় দিতে পারে না।

দাঁতে দাঁত চেপে শর্মিলা বলে, গাড়ি চালিয়ে এনেছে কে? মহেন্দ্র?

অপরেশ বলে, না, আমি নিজেই। তুই বাপু একটু চায়ের জল চাপা বরং।

শর্মিলা অধোমুখে ফিরে আসে রান্নাঘরে। জনতা স্টোভে বসিয়ে দেয় চায়ের জল। রমলা বলে, কী ঠিক করলি দিদি? যাবি তুই?

শর্মিলা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলে, কেন যাব না?

—ঐ ভোলা মহেশ্বরকে নিয়ে?

—কেন দক্ষযজ্ঞ হবে ভাবছিস?

—না, সে ভয় নেই। ওঁকে অপমান করবার ক্ষমতা কারও নেই।

হয়তো ভাল অর্থেই রমু এ কথা বলেছিল। আনন্দের উদারতা, সরলতাটাকেই সে বড় করে দেখাতে চেয়েছিল হয়তো—কিন্তু শর্মিলার তা মনে হয়নি। শর্মিলার মনে হয়েছিল রমুর ও কথাটার ভিতরেও বাঁকা ইঙ্গিত আছে। যেমন ছিল অপরেশের কথায়।

গাড়িতে ওদের তুলে দিয়ে আনন্দ ফিরে এসে বললে, ভারি সুন্দর মানুষ কিন্তু অপরেশবাবু। কী সরল অন্তঃকরণ।

শর্মিলা বলে, সরল মানুষের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে যাবে না?

আনন্দের মনের মেঘ বোধ করি কেটে গিয়েছিল। বললে, কেন যাব না? বাড়ি এসে নিমন্ত্রণ করে গেলেন—

শর্মিলা বলে, না এলেও যেতে তুমি। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করে নিতে না হয়।

আনন্দ তবু হেসে বলে, আমি লোকটা ভারি পেটুক, না?

সে হাসি দেখে জ্বলে উঠেছিল শর্মিলা। জবাবে বলেছিল, শুধু পেটুক

নয়, কৃপণ। একদিন বাজার খরচাটা তো বাঁচবে। পরের পয়সায় পোলাও কালিয়া খেয়ে আসা মন্দ কি ?

একটু যেন ম্লান হয়ে গেল আনন্দ। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, তা যা বলেছ।

আরও জ্বলে উঠে শর্মিলা বলে, তোমার লজ্জা করে না ?

এবার চোখ থেকে চশমাটা খুলতে হয় আনন্দকে।

—কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা হবার নয়। খরচ বাঁচবে না, বাড়বে।

আনন্দ শুধু মুখ তুলে তাকায়।

—নিমন্ত্রণ খেতে গেলে একটা উপহার নিয়ে যেতে হবে তো ?

—নিয়ে যাব না হয়।

কী নিয়ে যাবে ? মাটির ফুলদানি ? মাস্টার-মশায়ের কাছ থেকে চেয়ে আনবে বুঝি আর একটা ?

সরল হলেও আনন্দ মূর্খ নয়। গম্ভীর হয়ে যায় সে।

—ছি ছি ছি ! তুমি কী ! লজ্জা শরমের বালাই নেই তোমার ?

আনন্দ চশমাটা মুছতে মুছতে বলে, না হয় একখানা শাড়ি কি গহনা নিয়েই যাওয়া যাবে।

—আবার ধার করবে বুঝি !

মুখটা নিচু করে আনন্দ বলে—সে হয়ে যাবে একরকম করে।

—সেই এক রকমটা কী রকম তাই তো জানতে চাইছি ! আমারই একখানা গহনা বেচে দেবে তো ?

এবার গলার স্বরটা বদলে যায় আনন্দের। বলে, না। আর যাই করি তোমার গহনায় আমি হাত দেব না। যে কখানা গহনা তোমার গায়ে আছে ওর একখানাও আমার দেওয়া নয়—

—ও ! মনে আছে দেখছি সে কথা।

আনন্দ ক্লান্ত স্বরে বলে, মনে আছে বইকি। ভুলবার যে উপায় নেই শর্মিলা। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছি এ কথা কি ভুলতে পারি ?

শর্মিলা গর্জে উঠেছিল, দেখ ! তোমার সব সহ্য হয়, এই ন্যাকামিটা আমি সইতে পারি না।

—ন্যাকামি !—প্রতিপ্রশ্ন করেছিল আনন্দ। তার জীবনের চরমতম ভ্রান্তিকে, তার গভীরতম বেদনার এই নামকরণে কেমন যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠেছিল সে।

—তা নয় তো কী ? এ কথা যেন বিয়ে করার পরেই জানতে পেরেছ তুমি ! কেন, বিয়ে করার আগে জানতে না কোন্ পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করছ তুমি ?

একাগত চারদিক থেকে বাধা পেলে একটা নিরীহ খরগোশও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আনন্দও সোজা হয়ে বলে, এতদিন শুধু শুনেই এসেছি শর্মিলা, আজ আমিও একটা প্রশ্ন করি। বিয়ে করার আগে তুমি কি জানতে না কোন্ পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তুমি?

শর্মিলাও উঠে দাঁড়ায়। বলে, এই যে, বোল ফুটেছে দেখছি। এইটাই বাকি ছিল। জবাবটা শুনে যাও। না, তোমাকে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। তিনটে মানুষের মুখের গ্রাস উপার্জনের ক্ষমতাও যে তোমার নেই, তা বুঝতে পারিনি। এম. এ তে ফার্স্টক্লাস পেয়েও কেউ যে তিনশো টাকার মাস্টারি—

বাধা দিয়ে আনন্দ বলেছিল, ব্যাস! চুপ—

—না। চুপ আমি করব না। চুপ করেই তো ছিলাম এতদিন। আজ আমার যা বক্তব্য তা আমি বলে নিতে চাই। শোন। তুমি আমাকে মুক্তি দাও। এ বাঁধন আর সইতে পারছি না আমি।

সত্যই সেদিন মনে হয়েছিল আনন্দ তাকে মুক্তি দিলে শর্মিলা বেরিয়ে যেতে পারে এ সংসারের আবর্ত থেকে। যেখানে তার নারীত্ব পর্যন্ত অবহেলিত, সেখানে দু-মুঠি অন্নের লোভে সে পড়ে থাকতে পারবে না। সেও আই এ. পাশ করেছে। অনায়াসে কোন মফঃস্বল স্কুলে মাস্টারি নিয়ে একটা পেট চালিয়ে নিতে পারবে। একক শয্যায় শয়ন করেই যদি বাকি জীবনের নিরানন্দ রাত্রিগুলোকে অতিবাহিত করা অনিবার্য হয়ে পড়ে পড়ুক; কিন্তু এভাবে স্বামীর সঙ্গে একই বাড়িতে একই ছাদের নিচে নয়। আজই সে একটা বোঝাপড়া করে নিতে চায়। বলে, বিশ্বাস কর তুমি, সত্যিই ভুল হয়েছিল আমার। ভুলের মাসুলও দিয়েছি আমি। এবার তুমি আমায় মুক্তি দাও।

আনন্দ বসে পড়ে। ক্লান্ত সৈনিকের মতো দেখাচ্ছে তাকে। ধীর সংযত কণ্ঠে বলে বেশ। কথাটা যখন তুমিই মুখ ফুটে বলতে পারলে তখন আমার পক্ষে সহজ হল জিনিসটা। সত্যি শর্মিলা, এভাবে চলবে না। আমার লেখাপড়া সব চুলোয় যেতে বসেছে। আমি কোন কিছুতেই মন দিতে পারছি না। আর সত্যিই যতটা উপার্জন করতে পারলে তুমি সুখী হতে, ততটা উপার্জনও নয় আমার। ভুলটা যখন দুজনেই বুঝতে পেরেছি তখন তা শুধরাতে হবে। মুক্তিই দিলাম তোমাকে। তুমি বাপের বাড়িতে চলে যাও। আর ফিরে এস না।

মুক্তি সত্যিই চেয়েছিল শর্মিলা; কিন্তু আনন্দের ভঙ্গিটায় আপাদমস্তক জ্বলে গেল তার। লোকটা মোটেই সরল নয়। বদমায়েশ একটা। সুবিধাবাদী, স্বার্থপর। শর্মিলার প্রতি তার কৌতূহল শেষ হয়েছে। পড়া-শেষ ডিটেকটিভ উপন্যাস যেন। একবারই পড়া যায় তাকে রুদ্ধশ্বাসে—তারপর সেটাকে খোঁজ করে না কেউ। শর্মিলা বাপের বাড়ি থাকুক; আর এখানে আনন্দ আপন

মনে ইতিহাস চর্চা করুক। কেউ বাধা দেবে না, কেউ বিরক্ত করবে না। ব্যবস্থাটা ভাল। শর্মিলা দেখতে চায় লোকটার দৌড়। বলে, বেশ তো বলছ বাপের বাড়িতে চলে যাও আর ফিরে এস না। কিন্তু আমাকে তারা খাওয়াবে পরাবে কেন?

আনন্দ বলে, সেটাও ভেবে দেখেছি।

—দেখেছ? খুব দূরদর্শী তো তুমি। কী দেখেছ শুনি?

—খোরপোশ দেবার সামর্থ্য আমার নেই—

আর এক ধাপ এগিয়ে যায় শর্মিলা। আঘাত দেবার জন্যই। বলে, ক্ষমতা নেই বললে তো আইন শুনবে না।

—শুনবে। আমি কথা দিচ্ছি, যে কোন অভিযোগ তুমি আনবে আমার বিরুদ্ধে আমি তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব। পুরোপুরি মুক্তিই দেব তোমাকে। আইনত সিদ্ধ হবে এ বিচ্ছেদ। তোমাকে মুক্তি দিতে সব অভিযোগই মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। অ্যাডালটারি, ইম্পোটেন্স, ভেনিরিয়াল ডিজিজ……

শর্মিলা বসে পড়েছিল। স্বেচ্ছায় নয়, আপনা থেকেই। তার মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল বুঝি! এত ঘৃণা! এতই অসহ্য সে আজ আনন্দের কাছে। কাল রাত্রে, আনন্দ যে ডিভোর্সের কথা, তুলেছিল সেটা তাহলে ওর মুখের কথা নয়—মনের কথা! মুক্তি বলতে শর্মিলা যা বুঝেছে আনন্দ তার চেয়ে আগে থেকেই এগিয়ে আছে এক পা! দুরন্ত অভিমানে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল শর্মিলা। উবুড় হয়ে পড়েছিল খাটের উপর। ফুলে ফুলে সে কাঁদতে থাকে। আনন্দ উঠে দাঁড়ায়। আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা পেড়ে গায়ে চরাতে চরাতে বলে, গৌরকে বলে আসছি, আজই সন্ধ্যায় সে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে—

—শোন।—উঠে বসে আবার শর্মিলা।

চৌকাঠের কাছে ফিরে দাঁড়ায় আনন্দ।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে শর্মিলা বলে, ডিভোর্স পিটিশানটা বরং তুমিই কর না কেন?

—কেন?

—তুমিই তো চাইছ সেটা।

—না। একা আমি চাইছি না। আমরা দুজনেই চাইছি।

—আমি চাইছি তা তো বলিনি আমি।

—মুখে না বললেও তো তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি আমি।

—মুখ দেখে মনের কথা কবে থেকে বুঝছ তুমি?

আনন্দ জবাব দেয় না।

শর্মিলা বলে, কিন্তু এখন তো আমি যাব না।

—কেন ?

—সামনে দাদার বিয়ে। এখন গেলে একটা উপহার তো নিয়ে যেতে হবে আমাকে। সে তো আবার তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না।

আনন্দ এ আঘাতটাও সহ্য করে নেয়। বলে, সে জন্য চিন্তা কর না, উপহারটা যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব আমি।

—মাটির ফুলদানি ?

আনন্দ এবার আর জবাব দেয় না। বেরিয়ে যায় বাইরের দরজা দিয়ে।

প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তারপর। আনন্দ ফিরে আসে না। ঘরের কাজকর্ম কিছুই সারা হয় না। চুপচাপ বসে থাকে শর্মিলা। কী করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারে না। চিন্তার পারম্পর্যও যেন হারিয়ে ফেলেছে। এতদিনে বোঝা গেল ব্যাপারটা। আনন্দের মনের কোন কোণাতেও আর স্থান নেই শর্মিলার। আনন্দ শর্মিলাকে তার জীবন থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু এটা তো ঠিক চায়নি সে। আনন্দের সঙ্গে সব সম্পর্ক কি সত্যিই চুকিয়ে দিতে হবে ? চিরকালের জন্য ?

সন্ধ্যাবেলা এসে হাজির হল গৌর গৃহবিশ্বাস। আনন্দের প্রিয় ছাত্র। বলে, আপনাকে কি আজই কলকাতায় রেখে আসতে হবে ?

শর্মিলা বলে, না, আজ নয়, কাল যাব আমি। তুমি কাল সকালে বরং একবার খোঁজ করে যেও।

গৌর স্বীকৃত হয়ে চলে যায়।

আশ্চর্য, আবার প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। ঘনিয়ে আসে রাত্রি। আলো জেলে প্রতীক্ষা করে শর্মিলা। রাত বাড়ে। কিন্তু সমস্ত রাত আনন্দ বাড়ি ফেরে না। সারারাত জেগে বসে থাকল সে। আনন্দ রাত কাটালো কোথায় ! পরদিন সকালেই এসে হাজির হল গৌর। বলে, এ বেলাতেই যাবেন তো ? না খাওয়া-দাওয়া সেরে ও বেলায় ?

শর্মিলা বলে, তোমার মাস্টার-মশাই কাল রাতে বাড়ি ফেরেননি।

—হ্যাঁ, তাই তো কথা ছিল। উনি দিন দশেক পরে ফিরবেন। ছুটি নিয়েই তো গেছেন। কেন, আপনি জানেন না ?

শর্মিলা তাড়াতাড়ি সামলে নেয়, ও হ্যাঁ, তাই তো !

—বাজার করতে হবে কিছু ?

—না। আজ এ বেলাতেই যাব আমি। তুমি গাড়ি ডেকে আন !

গৌর একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর চলে যায় রিকশা ডেকে আনতে।

একবার ভেবেছিল একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবে। তারপর মনে হল

কী দরকার ? সামনাসামনি বসে যে কথা বোঝানো যায়নি একখণ্ড চিঠিতে কি তা বোঝানো যাবে ? আধঘণ্টার মধ্যেই স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মতো সে-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল শর্মিলা। গৌর বাড়িতে তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে রাখে। বলে, স্যার এলে দিয়ে দেব।

সে আজ এক বছর হয়ে গেল। তারপর অনেক জল বয়ে গেছে গঙ্গা দিয়ে। শুধু গঙ্গা দিয়েই বা কেন ? শর্মিলার বুকের উপত্যকা দিয়েও। অপরেশের বিয়েতে আনন্দ আসেনি। আসবে না জানাই ছিল, কিন্তু রতনদাদু এসেছিলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। বহরমপুর থেকে খবর পেয়ে তিনি এসেছিলেন। আনন্দ তাঁকে ধরে বেঁধে পাঠিয়েছে বিয়েবাড়ি—কলকাতায়।

স্বাগতা আহতা হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। একটিমাত্র জামাই, তাকে অপরেশ নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। অথচ সে এল না। শর্মিলা অবশ্য জানতই আনন্দ আসবে না। রতনদাদুকে নিয়ে গিয়ে বসালো ওর ঘরে। রতনদাদু কোটের ভিতর পকেট থেকে বার করে আনেন একছড়া জড়োয়া মালা। তুলে দিলেন শর্মিলার হাতে, বলেন, আন্দ' দিয়েছে তোমাকে দিতে।

হাত বাড়িয়ে মালাটা নিতে হাতটা কেঁপে উঠেছিল শর্মিলার। বাড়ি ভর্তি লোকজন, তবু নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, এর যে অনেক দাম, দাদু! এ সে কোথায় পেল!

রতনদাদু চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, সে অনেক কথা দিদি। আর দামের কথা বলছ ? স্যাকরা নিয়েছে সাড়ে বারোশো টাকা; কিন্তু ও মালটার দাম তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

কথাটার শেষ দিকের ইঙ্গিতটাতে শর্মিলা গুরুত্ব দেয়নি। প্রথমার্ধটাই তাকে একেবারে বিহ্বল করে দিয়েছিল, বলে, সাড়ে বারোশো টাকা! এ সে পেল কেমন করে ?

রতনদাদু মাথা নেড়ে বলেন, সব কথা তো এখন বলতে পারব না দিদি। কিন্তু তুমি বিয়ে মিটে গেলেই ফিরে যেও। আনন্দের শরীর ভাল নয়।

শরীর শর্মিলারও ভাল ছিল না। স্বাগতা ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তারের কাছে। সেখানে তাকে ধমক খেতে হয়েছে। শর্মিলাকে অনেক আগেই নাকি নিয়ে আসা উচিত ছিল ডাক্তারের কাছে। সে রক্তাল্পতায় ভুগছে। শর্মিলা সেসব প্রসঙ্গ তুলল না, বললে, কেন, কী হয়েছে তাঁর ?

রতনদাদু ঢোক গিলে থেমে যান। আনন্দকে তিনি শেষ দেখে এসেছেন হাসপাতালে। সেখানে তাকে কথা দিয়ে এসেছেন সব কথা এখানে বলবেন না। আনন্দ বারে বারে তাঁকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছিল, বিয়ে বাড়িতে তার দৃষ্টিহীনতার কথা প্রকাশ করে দেবেন না। তবু সব কথা গোপনই বা করে

যান কেমন করে ? বলেন, না. বিশেষ কিছু নয়। তবু হাজার হোক সেটাই তো তোমার নিজের বাড়ি।

শর্মিলার ঠোঁট দুটি কুঁচকে যায়। বলে, নিজের বাড়ি! যার চাবি থাকে আপনার নাতির ছাত্রের পকেটে ?

রতনদাদু ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না, তবু তিনি কিছুটা আন্দাজ করেই এসেছিলেন। ওদের স্বামী-স্ত্রীতে যে একটা মনোমালিন্য চলছে তা অনুমান করেছেন তিনি। বলেন, রাগ করিস না দিদি, সেখানে শাকান্নই জুটুক আর উপবাসই করিস সেই তো তোর নিজের বাড়ি।

শর্মিলার চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। বলে, পরামর্শটা কি আপনার, না তিনিই বলে পাঠিয়েছেন আপনাকে দিয়ে ?

এবার স্পষ্টই আহত হয়েছিলেন বৃদ্ধ। অপ্রস্তুতও হয়েছিলেন। মনে হল, বড় লোকের মেয়ের কাছে এতটা প্রগল্‌ভ না হলেই পারতেন। সামলে নিয়ে বলেন, না. সে কিচ্ছু বলেনি। তাকে তো চিনি—মরে গেলেও সে তোমাকে বিরক্ত করবে না।

শর্মিলা বলে, শাকান্ন আর উপবাসটা তো রইলই দাদু অঙ্গের ভূষণ হয়ে, আপাতত দুদিন ভাল মন্দ খেয়ে নিই বাপের বাড়িতে।

রতনদাদু চুপ করে গেলেন।

আজও ভাবে শর্মিলা—কেন সব কথা গোপন করে গিয়েছিলেন সেদিন রতনদাদু! কেন খুলে বলেননি শর্মিলাকে যে আনন্দ হাসপাতালে পড়ে আছে তখন ? সে কি শর্মিলার ঐ কড়া কথাগুলোর জন্য অভিমানে, না কি আনন্দকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন বলে ? অথবা তিনি ভেবেছিলেন সংবাদটায় বিবাহ বাড়ির আনন্দ-উৎসবে একটা বিপর্যয় দেখা দেবে। কেন যে তিনি গোপন করেছিলেন তা আজও জানে না শর্মিলা। কোনদিনই আর জানা যাবে না। কিন্তু এটুকু জানে যে, সেদিন রতনদাদু অন্তত জানতেন আনন্দ চিরদিনের মতো দৃষ্টি খুইয়েছে। চোখের শিরা ছিঁড়ে গেছে তার। প্রাণে বেঁচেছে এই যথেষ্ট। হাসপাতাল থেকে সে ফিরে আসবে একদিন কিন্তু চোখের ব্যান্ডেজ খুলে দিলেও আর আনন্দ কোনদিন এই আলোয় ভরা দুনিয়ায় ফিরে আসবে না। তার বাকি জীবনটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চিরদিনের জন্য। রতনদাদু তখনও জানতেন না আনন্দের চোখ খোয়ানোর চেয়েও মর্মন্তুদ সংবাদটা। আনন্দ সে কথাটা বলেনি রতনদাদুকে। সে তার আত্ম-হত্যার কথা। আত্মহত্যা নয়, আত্মার হত্যা। অপরেশের নববধূর জন্য এই জড়োয়া হারটা কিনে দিতে সে হাজার টাকা খরচ করেছে। এত ভাল উপহার কেউই দেয়নি নববধূকে। শর্মিলা সবার উপরে টেক্কা দিয়েছে সেদিক থেকে। হারছড়া সে সকলকে দেখিয়েছে সগর্বে। উপহারের দামটা জিজ্ঞাসা করা

নাকি এটিকেটে বাধে। অথচ কৌতূহল প্রবল। অনেকেই কানে কানে প্রশ্নটা করেছে শর্মিলাকে। শর্মিলা হেসে কানে কানেই বলেছে -বলবেন না কাউকে সাড়ে আঠারো!

চোখ কপালে উঠেছে শ্রোতার। প্রতিপ্রশ্ন করেছে কেউ কেউ, তবে যে শুনেছিলাম, কলেজের অধ্যাপক?

শর্মিলা হেসে বলেছে, ভুল শোনেননি, কিন্তু আমার শ্বশুর স্কুল-মাস্টারি করেননি। বহরমপুরে সামান্য কিছু জায়গা জমি কিনেছেন—

—বুঝেছি, বুঝেছি। তাই বুঝি কর্তার হাতে এতদিনে এসেছে জমিদারী কমপেনসেশনের টাকা!

শর্মিলা স্মিত হেসেছে। একটাও মিছে কথা না বলে স্বামীর সম্মান, মায়ের মর্যাদা রক্ষা করেছে। অথচ কিসের যেন গ্লানিতে ক্লান্ত অবসাদে মাঝে মাঝে ছুটে পালিয়ে গেছে নিজের ঘরে। বালিশে মুখ গুঁজে রুদ্ধ কান্নাটাকে গলা টিপে মেরেছে—যাতে বিয়ে বাড়ির কেউ না টের পায়।

বিয়ে মিটে গেল। বৌভাতও মিটল। স্বাগতা এসে জানতে চাইলেন আসল কারণটা। প্রেজেন্টেশানটা দেখেই তাঁর মত বদলে গেছে। মিসেস খাণ্ডেলওয়ালা, মেজর গুপ্ত, ব্যারিস্টার বোস, রুস্তমজী, গোয়েঙ্কা সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন মালাছড়ার। বলেছিলেন, এবার একবার জামাই আনতে গাড়ি পাঠাই, কী বলিস? রাগারাগি করে এসেছিস নাকি? চিঠিপত্র দেয় তো?

শর্মিলা খুলে বলেছিল সব কথা।

সব কথা নয়, আসল কথাটা সে তখনও জানতই না। জেনেছিল অনেক পরে, একেবারে ঘটনাচক্রে।

সেদিন কী জানি কেন ওরা মনটা ভাল ছিল না। হাতে কাজ ছিল না কোন. পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ বের হয়ে পড়ল ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কার্ডখানা। মনটা কেমন করে ওঠে। শর্মিলা চলে এসেছিল সেই ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে। ভেবেছিল কাটিয়ে আসবে একটা অলস সন্ধ্যা, সেই স্মৃতিবিজড়িত রেইন্ট্রি গাছের তলায়। সেখানেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল গৌরের সঙ্গে। একটা বই হাতে সে বেরিয়ে আসছে লাইব্রেরির চওড়া সিঁড়ি দিয়ে। ওকে দেখেই শর্মিলা খুশী হয়ে ওঠে। এগিয়ে যায় ওর কাছে। গৌর আনন্দের প্রিয় ছাত্র। প্রায়ই আসত আনন্দের কাছে পড়াশুনার কাজে। শর্মিলার সঙ্গেও তার একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। উমার সঙ্গেও। শর্মিলাকে সে দিদি বলে ডাকত। অথচ সে সেদিন ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে শর্মিলাকে দেখেও দেখতে না পাওয়ার ভান করে।

কিন্তু শর্মিলা ওকে এড়িয়ে যেতে দেয় না, এগিয়ে এসে বলে, দিদিকে চিনতেই পারছ না নাকি ?

গৌর দুটি হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে জবাব দেয়, না ।

—পাশ করেছ তো ? অনার্স পেয়েছিলে ?

গৌর মুখটা নিচু করেই বলে, পেয়েছিলাম ।

—কোন ক্লাস ?

- সেকেন্ড ।

—খাওয়া-পাওনা হয়েছে তাহলে বল ?

গৌর জবাব দেয় না। শর্মিলা একটু অবাক হয় ; বলে, এম. এ পড়ছ তো ? কোথায় আছ ?

আমি এবার যাই ।

শর্মিলা শুধু আহত নয়, অপমানিত বোধ করে। এ ছেলেটির অনেক স্নেহের অত্যাচার তাকে একদিন সহ্য করতে হয়েছে। অনেক আবদার সইতে হয়েছে। ওর নিরাসক্ত উদাসীনতায় তাই শর্মিলা আহত হয়। বলে কোথায় যাচ্ছ ? তাড়াতাড়ি আছে বুঝি ?

—না, তাড়াতাড়ি কিসের ?

—তবে ?

—কী তবে ?

—কিছু না, যাও ।

গৌর চলতে থাকে দ্বিতীয়বার ওর দিকে না তাকিয়ে। কেমন যেন আপাদ-মস্তক জ্বালা করে ওঠে শর্মিলার। বলে, শোন ।

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ায় ।

শর্মিলা বলে, এখন তোমাদের যে অধ্যাপক পড়ান, তাঁর স্ত্রীর ফুলদানির জন্যও তুমি ফুল নিয়ে যাও ?

মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে গৌরের। হুগলীর বাসায় শর্মিলার মাটির ফুলদানিতে সে বহুবার ফুলের যোগান দিয়েছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বলে, কথা আমি বলতে চাইনি ; আপনি বয়সে আমার চেয়ে বড়, সম্পর্কেও। কিন্তু আপনি জোর করে আমাকে দিয়ে বলালেন। তাই বলছি, আপনার সঙ্গে কথা বলতে আজ আমার ঘৃণা হচ্ছে ।

বজ্রাহতের মতো কয়েকটা মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শর্মিলা। তারপর হঠাৎ কিসের একটা আশঙ্কায় সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ঠিক কী মনে হয়েছিল, আজ আর মনে পড়ে না। হঠাৎ গৌরের হাত দুটি ধরে বলেছিল, কেন গৌর ? কী হয়েছে ? এত ঘৃণা কেন ?

গৌরও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, সে কি ? আপনি কি জানেন না ?

—কী জানি না ?

—মাস্টার-মশায়ের কথা ?

—মাস্টার-মশায়ের কথা ! কী কথা ? কেন. কী হয়েছে তাঁর ?

গৌর বুঝতে পারে শর্মিলা কিছুই জানে না। লজ্জা পায় সে। দুজনে গিয়ে বসে সেই রেইন্ট্রি গাছের তলায়। ধীরে ধীরে সব কথা গৌর খুলে বলে। তার চলে আসার পরের কথা। যেটুকু সে জানে, শুধু সেইটুকুই। কিন্তু যে কথা সে বলল না তাও যে বুঝতে পারল শর্মিলা। দুঃখে বেদনায় সে একেবারে নীল হয়ে গেল। সেখানেই প্রথম সে জানল আনন্দ দৃষ্টিহীন। শুধু তাই নয়, আনন্দ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এ আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা নয়, আত্মার হত্যা। যে হারছড়া সে সগর্বে দেখিয়েছে জনে জনে সেই হারছড়ার মূল্য মাত্র হাজার টাকা নয়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। শর্মিলাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে ঐ হারটা কিনতে গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল গৌরের মাস্টারমশাই। ঐ হারটির বিনিময়ে তাকে লিখে দিতে হয়েছিল দ্বাদশটি জাগর রাত্রির যন্ত্রণায় ইতিহাসের একটি প্রশ্নোত্তরের বই—যার লেখক হিসাবে নাম ছাপা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপকের!

গৌর এ কাহিনীর উপসংহারে বলেছিল, আর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানেন দিদি ? ঐ নোটবইটা দেখলেই আমার কান্না পায়—অথচ ঐ বইটা পড়েই এই পরীক্ষাই পাশ করেছি আমি। আমি আজও ভেবে পাই না—কেন এমন ছোট কাজটা করলেন মাস্টার-মশাই ! এই সব নোটবইয়ের উপর তাঁর আন্তরিক ঘৃণার কথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। তিনি নিজেই শেষ পর্যন্ত তাই লিখলেন ? তাও আবার বেনামে ? ছিঃ।

* * *

—মাইজি ! এ মাইজি !

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে শর্মিলা ! এ সে কোথায় ?

—ঘর যাইব না ? রাত তো বহুত ভেল !

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে চমকে ওঠে শর্মিলা। রাত সওয়া এগারোটা। গড়ের মাঠে সেনোটাফের সামনে বসে আছে সে ! ঘুমাচ্ছিল নাকি এতক্ষণ ? পাহারাওয়ালাটা তাকে ডেকে দিতে এসেছে। এ নির্জন স্থানে এমন একজন তরুণীর একা বসে থাকাটা সে ভাল চোখে দেখেনি। আশ্চর্য, রেড রোডের ধারে এই নির্জন স্থানে ঘণ্টা-তিনেক সে চুপচাপ বসে আছে ! পুলিশটা তাকে ডেকে না দিলে সে কি সারারাত্রিই ওখানে পড়ে থাকত নাকি রাত্রিচারিণী মদালসার মতো ? আর কালকের কাগজে একটি চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনার বিজ্ঞাপ্তির সঙ্গে শেষ হয়ে যেত একটি জীবন। লুপ্ত হয়ে যেত একটি সমস্যাকণ্টকিত মেয়ের দীর্ঘশ্বাস।

ট্যাক্সিটা যখন এসে দাঁড়ালো পরিচিত পোর্টিকোর নিচে তখন বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন স্বগতা আর অপরেশ। পয়সা চুকিয়ে দিয়ে শর্মিলা আর মুখ তুলে তাকায়নি। তাকালে দেখতে পেত অপরেশের পেছনে দেখা যাবে রঘুর উঁকি দেওয়া মুখখানা—দ্বিতলের জানালায় আলো-না জ্বালা ঘরে দাঁড়িয়ে সরমা।

ভেবেছিল একটা হৈচৈ হবে, কিন্তু কেউ কিছু বলল না ওকে। এমন অস্বাভাবিক রাত করে সে একা কখনও ফেরে না। নাইট শোতে সিনেমা বা থিয়েটার দেখে এর চেয়েও বেশী রাত্রে ফিরেছে সে, কিন্তু কখনও একা নয়, দল বেঁধে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এভাবে খবর না দিয়ে নয়।

শর্মিলা সহজ হবার জন্যে বলে—বড্ড রাত হয়ে গেছে আজ। তোমরা সবাই খেয়ে নিয়েছ তো?

স্বাগতা বলেন—বাইরে ডিনারের নিমন্ত্রণ থাকলে বাড়িতে বলে যাবারও দরকার মনে কর না?

—ডিনারের নিমন্ত্রণ! মানে?

স্বাগতাও চমকে উঠে বলেন—তার মানে? কোথায় খেয়েছিস তুই তাহলে? গ্র্যান্ডে?

শর্মিলা জবাব দেবে কি, রীতিমত বোকা বনে যায়।

অপরেশ বলে—এই মাঝরাতে ও প্রসঙ্গ আর কেন মা? শুতে যাও, কাল বরং শোনা যাবে।

স্বাগতা বললেন হ্যাঁ, একটা রাতের মধ্যে যা হোক কৈফিয়ত একটা খাড়া করতে পারে ও, তাই না! তোরা সবাই সমান।

শর্মিলার ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায়। সে বলে—কৈফিয়ত! কিসের কৈফিয়ত?

—এই তোমার মাঝরাতে বাড়ি ফেরার! গর্জে ওঠেন স্বাগতা!

শর্মিলার কান দুটো জ্বালা করে ওঠে। কচি খুকি সে নয়। ভালমন্দ বুঝবার জ্ঞান তার হয়েছে। বলে—কী বলছ মা?

স্বাগতা জবাব দেবার আগেই রমলা এগিয়ে আসে। বাধা দিয়ে বলে—আঃ, কী হচ্ছে দিদি। আয়, ঘরে আয়। সত্যিই খেয়ে এসেছিস, না খাবি কিছু?

স্বাগতা তবু কিছু বলতে যান। রমলাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে—মাঝরাতে আর নাটক কর না মা। চাকর ঠাকুররা এবার উঠে পড়বে।

স্বাগতা অস্ফুটে শুধু বলেন—নাটক!

শমুর হাত ধরে রমলা তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে ওপরের ঘরে। বলে—নে কাপড় ছাড়, মুখে হাতে জল দে।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে শর্মিলা। কিন্তু রমু আর এতটুকু মেয়ে নয়। সে এগিয়ে এসে তার হাত দুটি ধরে বলে—তুই কেন অবুঝ হচ্ছিস বল তো দিদি।

মায়ের দিকটাও ভেবে দেখ। সারাটা দুপুর ধরে ভালমন্দ পাঁচ পদ রাঁধালেন ঠাকুরকে দিয়ে। কী, না বিকাশদা খাবে। তারপর তুই তাকে আনতে গেলি, মাঝরাতে ফিরে এলি একা।

—কিন্তু সে না এলে আমি কী করব ?

—কী করবি তাও কি বলে দিতে হবে ? হয় বাড়িতে এসে খবর দিবি, নয় গ্র্যান্ড হোটেল থেকেই একটা ফোন করবি।

শর্মিলা চুপ করে থাকে। কথাটা রমু অন্যায় বলেনি। তারই দোষ।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রমলা আবার বলে—রাত দশটা পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে নানান জাতের দুর্ভাবনায় ডুবে ছিলাম। দাদা এয়ার ইন্ডিয়ায় ফোন করে জানাল প্লেন নিরাপদে পৌঁছেছে। তোর অফিসে ফোন করে শোনা গেল বেলা তিনটের সময় তুই বেরিয়েছিস। ব্যাস, আর কোন খবর নেই। প্রায় সাড়ে-দশটার সময় বিকাশদা ফোন করে জানালেন যে, তিনি গ্র্যান্ডে উঠেছেন আর তুই কোন বান্ধবীর বাড়িতে গেছিস, কার বুঝি জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে।

রমু বলল - কার জন্মদিন রে দিদি ?

—তুই চিনবি না। বলে শর্মিলা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে বাথরুমে।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পর অন্ধকার ঘরে আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গটা তুলল রমলা, বললে—দিদি, ঘুমোলি ?

—না ঘুমোই নি, কেন রে ?

—আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারিস না ?

—কী কথা ?

—সব কথা। এই তুই এখন কী ভাবছিস, বিকশদার সঙ্গে কী কথা হল, কেন সে হোটেলে উঠল ?

শর্মিলা মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেলে। একজনের কাছে বুকের বোঝা নামিয়ে দিতে পারলে মানুষ শান্তি পায়। মানুষ সহানুভূতির কাঙাল। আনন্দের সব কথাও একদিন রমলাকে খুলে বলেছিল। শুধু বলতে পারেনি, যা বলা যায় না, আনন্দ অন্ধ হয়ে গেল কেন ? মনে আছে, এমনি আর একটি আলো-নেভা রাত্রির অন্ধকারে মন উজাড় করে দিয়েছিল রমুর কাছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে। সেদিনও রুদ্ধ কান্নায় বুকের ভেতরটা পাষাণ হয়ে উঠেছিল। সেদিনও সে সহানুভূতির কাঙাল হয়ে পড়েছিল। বিধাতার দেওয়া প্রথম আশীর্বাদটিকে সে বুকে পায়নি। সেই বঞ্চিত মাতৃত্বের বেদনায় সেবার কথা বলতে পেরেছিল রমলাকে। সব শুনে রমলা বলেছিল—কিন্তু কিসের আকর্ষণে আনন্দদা ছুটে গেল অমন করে বই লিখতে ?

শর্মিলা জবাব দেয়নি। মনে মনে বলেছিল—আকর্ষণে নয় রে রমু, বিকর্ষণে ; আর সেইটাই তো আমার ট্র্যাজেডি।

স্বাগতা কিন্তু খুশী হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছেলে কোলে ফিরে এলেই বরং বিব্রত হতেন তিনি। ছেলে! হ্যাঁ ছেলেই তো হয়েছিল ওর। সাড়ে সাত পাউন্ড ওজন ছাড়া আর কিছু জানে না সে তার ছেলের কথা। চোখেও দেখতে দেয়নি ওকে। এ কী ওর কম দুঃখ! আচ্ছা, আনন্দ কি জানে? উমার কাছে সে নিশ্চয় শুনেছে কিছুটা। তার পরের খবরটা জানবার আর তার কৌতূহল নেই! এতই পর হয়ে গেছে সে?

স্বাগতা কিন্তু দুঃখিত হননি এক তিলও। তাঁর মনে হয়েছিল শমু রক্ষা পেয়েছে বন্ধনের হাত থেকে। ভগবান রক্ষা করেছেন। বলেও ফেলেছিলেন সে কথা। এবং সে কথা শুনেই প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়েছিল শর্মিলা। স্বাগতা নিশ্চয় ভেবেছিলেন, দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সময় ঐ একফোঁটা সত্তাটাই হয়ে পড়ত প্রচণ্ড বাধা। কিন্তু শর্মিলা তো সেকথা ভাবেনি। দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা তখন তার দূরতম স্বপ্নেও ছিল না। তখনও ওর বাঞ্ছিত মাতৃত্ব—

—বলবি সব কথা আমায়?—আবার তাগাদা দেয় রমু।

শর্মিলা মন স্থির করে ফেলে। হ্যাঁ, বলবে, সব কথাই সে খুলে বলবে রমলাকে। মনটা হালকা করার জন্য নয়, সে রমুর মধ্যে একজন সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষিণীর সন্ধান পেয়েছে। রমু আর ছেলেমানুষ নয়। সে যেন শমুরই দ্বিতীয় সত্তা। পাঁচ বছর আগেকার শমু। সে ওর কাছে এখন সাহায্য চায়, সহানুভূতি চায়, পরামর্শ চায়।

অন্ধকার ঘরের এই এক সুবিধা। মনের কথা যদি কাউকে খুলে বলতে চাও, অন্তরের অন্তরতম বেদনাকে রূপ দিতে চাও, তাহলে নিবিয়ে দাও ঘরের বাতি। মনের কথা কারও মুখের দিকে চেয়ে বলা যায় না, চোখকে নিষ্কৃতি দাও, চক্ষুলজ্জাও চোখ বুজবে তাহলে। একটি একটি করে সব কথাই খুলে বলল শর্মিলা। সব শুনে রমলা বলে—কিন্তু বিকাশদাকে নিয়ে তুই কি সুখী হতে পারবি?

শর্মিলা প্রতিপ্রশ্ন করে—তোর কি মনে হয়?

—আমার? অন্ধকারের মধ্যেই শোনা যায় রমুর কণ্ঠস্বর—আমার তো মনে হয়, না। না আনন্দদা, না বিকাশদা কেউই সুখী করতে পারবে না তোকে।

কেন?

—একজন অত্যন্ত আইডিয়ালিস্টিক, একজন অত্যন্ত প্র্যাগম্যাটিক। একজন 'উদারা', একজন 'তারা'। তোর স্কেলে ওরা কেউই গাইতে পারবে না।

এত দুঃখেও হাসি পায় শমুর। কী কথা বলার ঢং! হেসে শর্মিলা বলে—তাহলে তুই কি বলিস? এই বুড়ো বয়সে মুদারা খুঁজে

বেড়াই পথেঘাটে ?

রমু গম্ভীর হয়ে বলে—তুই হাসছিস, আমি কিন্তু সিরিয়াস।

শর্মিলা কোনক্রমে হাসি চেপে বলে—তাহলে আমি কী করব ?

—বিকাশদাকে ছেড়ে দিবি।

—বেচারি কাঁদবে যে ?

—কাঁদবে না। আমিই তো আছি। আমি ওকে নিয়ে ইলোপ করব। তুই পারবি না। আমার পাল্লায় পড়লেই ওর চালিয়াতি শেষ হবে।

শমু হেসে বলে —তা হবে ; কিন্তু আমার কি হবে ?

—তুই বহরমপুরেই ফিরে যা।

—অন্ধ মাস্টারের খপ্পরে ?

রমু জবাব দেয় না।

—কি হল, কথা বলছিস না যে ?

—আমার একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দিবি ?

—বলেই দেখ না।

আনন্দদার সঙ্গে তোর মূল বিরোধটা কিসের ?

—কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত···

ওকে বাধা দিয়ে রমলা আবার বলে—প্লীস দিদি। আজকে আমার সব কথা এভাবে উড়িয়ে দিস নে। আনন্দদার সংসার যে সচ্ছল নয় তা তুই বিয়ে করবার আগেই জানতিস। তুই আমার মতো সেন্টিমেন্টাল খামখেয়ালী নস। সব দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে তবেই তাকে বিয়ে করেছিলি। আনন্দদার উপার্জনের স্বল্পতা যে কারণ নয় তা আমি জানি। আসল কারণটা যদি না বলতে চাস, বলিস না। কিন্তু বাজে ব্লাফ দেবার চেষ্টাও করিস না।

—কিন্তু ও যে অন্ধ হয়ে গেছে এটা তো···

আবার ওকে বাধা দিয়ে রমু বলে ওঠে—তাই তো জানতে চাইছি আমি। কিন্তু আনন্দদার যখন চোখ ভাল ছিল তখনই তো তুই চলে এসেছিলি।

এবার জবাব দেয় না শর্মিলা।

রমলা আবার বলে—আচ্ছা, আর একটা কথার জবাব দে। ধর, যদি আজ খবর পাস আনন্দদা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তাহলে তুই কী করবি ?

শর্মিলা বলে—এমন অ্যাবসার্ড হাইপথেসিসের কী জবাব দেব ?

—তবু দে না।

একটু ভেবে নিয়ে শর্মিলা বলে—তাহলে আবার ফিরে যাই বহরমপুরে।

—সত্যি বলছিস ?

—সত্যিই বলছি রে। শুধু তাই কেন, যদি সে দৃষ্টি ফিরে নাও পেয়ে থাকে, যদি জানতে পারি সে আমাকে আজও—

হঠাৎ চুপ করে যায় আবার।

—থামলি কেন ?—রমু তাগাদা দেয়।

—সেসব ভেবে আর কী হবে ?

কথাটা তার শেষ হয় না। পট করে বেড সুইচ জেলে দেয় রমলা।

—ও কি হল ?

রমলা উঠে বসে। বলে, তাহলে এই চিঠিখানা পড়।

চিঠি! কার চিঠি ? উঠে বসে শর্মিলাও।

বালিশের তলা থেকে একখানা খাম বার করে রমলা বলে—তোরই চিঠি। সেই কালকের চিঠিখানাই। উদ্ধার করেছি দাদার জামা কাপড় ডাইংক্লিনিং-এ পাঠাতে গিয়ে।

খোলা খামখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে শর্মিলা বলে তার মানে ?

তার মানে চিঠিখানা ওঁরা নষ্ট করেননি। শুধু তাই নয়। ওটার কনটেন্টস ওঁরা এখনও জানেন না। দাদার পকেট থেকে মুখবন্ধ খামটাই পেয়েছি আমি।

শর্মিলা খামটা তুলে দেখায়। সেটা খোলা।

—ওটা আমিই খুলেছি। রাগ করলি ?

শর্মিলা জবাব দেয় না। খাম থেকে কাগজখানা বার করে এক নিঃশ্বাসে পড়তে থাকে। চিঠি লিখছে আনন্দ নয়, উমা। পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় শমু। উমা লিখেছে ঃ

বৌদি,

এর আগেও তোমাকে খানচারেক চিঠি লিখেছি। তুমি জবাব দাওনি। জানি না, সেগুলি তোমার হাতে পেঁছেছে কিনা। জানি না, তুমি সেগুলি পড়েছ কিনা। তবু আজ তোমাকে লিখছি। অনেক কথা বলার ছিল, বলতে গিয়েছিলুমও একদিন—তোমার মা দরজার বাইরে থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে তো তুমি জানই।

তোমাকে আমি ঘৃণা করি। আন্তরিক ঘৃণা। তোমাকে চিঠি লিখবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না। লিখতে হচ্ছে দাদার নির্দেশে। তিনি জানতে পেরেছেন তুমি আবার বিয়ে করছ এবং তার আগে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করছ। অত্যন্ত দুঃখের কথা, দাদা ক্রমশ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছেন। ডাক্তারবাবুরা বলেন, হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পাবেন তিনি। তাই আমাকে তিনি বলেছেন তোমাকে চিঠি লিখে জানাতে, তুমি যেন দাদার অন্ধত্বের কারণ দেখিয়ে ডিভোর্সের আবেদন পত্র পেশ কর না। কারণ তাহলে সে অনুমতি পেতে মুশকিল হবে তোমার। তোমার মতো দাদাও মুক্তি চায়। তাই ছোট বোন হয়ে লিখতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে তবু দাদার নির্দেশে লিখছি—তুমি আবেদন পত্রে লিখ দাদা পিতা হবার উপযুক্ত নন।

দাদা সে অভিযোগ স্বীকার করে নেবেন।

আমার চিঠিখানা পড়েই পুড়িয়ে ফেল। আর কাউকে দেখিও না। কোর্টে এ চিঠি পেঁছালে বা এর কোন সাক্ষী থাকলে হয়তো ডিভোর্স পেতে অসুবিধা হবে তোমার। সম্পর্কে তুমি আজও বড়; তাই পত্রশেষে প্রণাম জানালুম। ইতি উমা।

চিঠি পড়া শেষ করে চুপ করে বসে থাকে শর্মিলা।

রমলা বলে—আশ্চর্য মানুষ কিন্তু আনন্দদা। যেন মানুষ নয়, আগাথা ক্রিস্টির একটা চরিত্র!

শমু ওর কথায় কান দেয়নি। সে ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে। বলে—এ চিঠির কথা আর কে জানে? আর কেউ পড়েছে?

—না।

দাঁতে দাঁত চেপে শমু বলে—রমু, তোকে খুলেই বলছি। সেবার তোকে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম। তখন তুই ছোট। আজ আর তুই ছোট নস। কাল সকালে আবার আমি বেরিয়ে যাব। আর ফিরব না। তুই মা-দাদাকে—

বাধা দিয়ে বলে—সেকি রে! বহরমপুর যাবি?

—যাব না? বলিস কি?

—জড়িয়ে পড়বি না তো? ভাল করে সব দিক ভেবে দেখেছিস তো?

—দেখেছি রে দেখেছি। আমাকে মুক্তি দিতে যে মানুষটা এতবড় বোঝা মাথায় তুলে নিতে পারে—

রমলা অবাক হয়ে বলে—কী বললি?

—বলছি যে, আমাকে মুক্তি দিতে যে লোকটা এত বড় কলঙ্কের বোঝা—

আবার ওকে বাধা দিয়ে রমলা বলে—তুই একটা গাড়োল। স্রেফ ইডিয়ট!

বোকার মত তাকিয়ে থাকে শর্মিলা। বলে—মানে?

—তুই ভেবেছিস, তোকে মুক্তি দেবার জন্য ঐ কথা লিখেছে আনন্দদা?

—না তো কি?

তোর মত মূর্খ দেখিনি! এ শুধু একটা ফাঁদ পেতেছে আনন্দদা। আর তুই সেই ফাঁদে পা দিচ্ছিস।

—তার মানে?

—তার মানে? ধর তুই ঐ ভাবে দরখাস্ত করলি। ধর, আমি বিবাদী পক্ষের উকিল। তোকে জেরা করছি—'আপনি কি অমুক নার্সিং হোমে এত তারিখে ভর্তি হয়েছিলেন?' কী বলবি তুই?

শমু চুপ করে বসে থাকে।

—ন্যাচারালি তুই বলবি—'হ্যাঁ'। কারণ সেটা ফ্যাক্ট। তারপর আমি

প্রশ্ন করব—'সেখানে আপনার একটি মৃত সন্তান হয়েছিল ?' তুই এবারে কী বলবি ? হসপিটাল রেকর্ডকে করোবরেট করা ছাড়া তোর উপায় নেই। আমার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দে এবার—সেই সন্তানের পিতা কে ?'

শর্মিলা এবারও জবাব দেয় না।

রমলা হো হো করে হেসে উঠে বলে—তোকে মুক্তি দেবার জন্য সরল আত্মভোলা অধ্যাপক মশাই কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিচ্ছেন, না রে ? ভাল মানুষের প্রেমে পড়েছিলি দিদি ! ঐ তো বললুম, আগাথা ক্রিস্টির নভেলেই ঐ সরল অধ্যাপক মশাইটিকে ভাল মানায়।

আলো নিভিয়ে দেয় রমলা।

শর্মিলার মাথার মধ্যে তখন ঝিমঝিম করছে।

বহরমপুর স্টেশনে এসে ট্রেনটা যখন পৌঁছালো তখন বেলা দ্বিপ্রহর। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তখন শর্মিলার। কাল রাত্রে খাওয়া হয়নি। আজ সকালে সকলে জেগে ওঠার আগে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল সে। একবস্ত্রে। যেমন ভাবে আর একবার বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি ছেড়ে। সকাল আটটার লালগোলা ধরে রওনা দিয়েছে। এখন বেলা দেড়টা। খিদে পাওয়া আর অন্যায় কি !

বহরমপুরে একবার মাত্র এসেছিল। পুজোর ছুটিতে। হুগলী থেকে আনন্দের সঙ্গে। এখানেই আনন্দের পৈতৃক ভিটে। চোখ এবং চাকরি খুইয়ে এখানেই আজ বছরখানেক এসে আছে ওরা ভাই বোন। পথটা মনে আছে। ঠিকানা তো জানাই। স্টেশন থেকে একখানা রিক্‌শা নিল শর্মিলা।

আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে রিক্‌শা চলেছে। শর্মিলা আবার আপন মনে ভাবতে থাকে। চিন্তার পারম্পর্য হারিয়ে যাচ্ছে তার। কেন সে এল এভাবে ? ঠিক বলতে পারে না। রমলা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। শর্মিলা নিজেই কি কম অবাক হয়েছে নিজের আচরণে। কিন্তু তবু আত্মসংবরণ করতে পারেনি। সে একবার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় আনন্দের। আর কোনও দুর্বলতা নেই তার মনে। কোন মোহ নেই। সে সরাসরি কৈফিয়ত তলব করতে চায় ঐ লোকটার। কেন সে এমন চিঠি লিখেছে উমাকে দিয়ে ? সে বারে বারে বলেছিল সে মুক্তি চায়, মুক্তি দিতে চায়। বলেছিল—যে কোন অভিযোগ তুমি আন, আমি মেনে নেব তা—অ্যাডালটারি, ইম্পোটেন্সি, ভেনিরিয়াল ডিজিজ ! তাহলে এভাবে শর্মিলাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা কেন ? কী ক্রূর অভিসন্ধি ! তাই বারে বারে বলেছে, চিঠিখানা, কাউকে না দেখাতে, কোন সাক্ষী না রাখতে —তাই বলেছে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলতে। যাতে পশ্চাদপসরণের কোন পথ না থাকে শর্মিলার। বিবাদীপক্ষের উকিল যখন প্রশ্ন করবে—আপনার স্বামী যদি পিতা হবার অনুপযুক্ত তাহলে আপনার মৃত সন্তানের জনক কে ? তখন

আদালতশুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠবে। বিচারক তাঁর হাতুড়ি দিয়ে টেবিলটা ঠুকে বলে উঠবেন—অর্ডার! অর্ডার! শর্মিলার চোখের সম্মুখে তখন দুলতে থাকবে আদালত কক্ষটা। বিবাদী পক্ষের উকিল হাস্য গোপন করে বলবেন—ধর্মাবতার! আমার জেরা শেষ হয়েছে।

সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে হবে শর্মিলাকে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা নামঞ্জুর।

কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আবার তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে ঐ আদালতেই। এবার আর বাদী নয়, বিবাদী সে। এবার তাকে উঠতে হবে আসামীর মঞ্চে। এবার মামলা এনেছেন অধ্যাপক আনন্দ মিত্র, স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঐ একই মামলা। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। অভিযোগ—স্ত্রী চরিত্রহীনা। প্রমাণ? আসামীর পূর্বমামলার সাক্ষের নথী।

শর্মিলাকে দ্বিতীয় বার ঐ একই প্রশ্ন করা হবে দ্বিতীয় মামলায়।

এবারও কোন জবাব দিতে পারবে না সে।

এবার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা মঞ্জুর করবেন বিচারক।

কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে শর্মিলার। আনন্দ এতবড় পাষণ্ড! আনন্দ ওকে যে এভাবে সর্বসমক্ষে অপমান করতে উদ্যত হবে এ ছিল শর্মিলার দুঃস্বপ্নেরও অগোচর! তাই সে ছুটে এসেছে বহরমপুরে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে চায় আনন্দকে। আনন্দ জবাব দিতে পারবে না। আর সেই নির্বাক মানুষটার গালে একটি চড় কষিয়ে দিয়ে শর্মিলা ফিরে আসবে পরের ট্রেনে।

—এই বাড়িই তো? না কি দিদি?

রিক্শাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়েছে ঠিকই। ভাড়া মিটিয়ে শর্মিলা রিক্শা থেকে নেমে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, এই বাড়িই। প'ড় বাড়ির সামনে কচু আর কালকাসুন্দির জঙ্গল। ইট বার করা ভাঙা প্রাচীরে ঘুঁটের নক্সা। পথে লোকজন নেই। কার্নিসের আবছায়ায় একজোড়া পায়রা আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বক্‌বকম্ শুধু শোনা যাচ্ছে স্তব্ধ মধ্যাহ্নে। বাইরের রোয়াকটা ছাগলের নাদিতে ভরা। আল-গোছে সেগুলি ডিঙিয়ে বাইরের ঘরে ঢোকে শর্মিলা। বাড়ির এই অংশটা আনন্দের ভাগে পড়েছে। বাইরের একখানা ঘর, আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্বিতলের ঘরখানা। পাশের ঘরটায় থাকেন রতনদাদু। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ে চৌকির ওপর একখানা ছেঁড়া মাদুর, তার ওপর একটা জড়ানো হোল্ডঅল আর সুটকেস। আনন্দ কি কোথাও যাচ্ছে? না কি আর কোন অতিথি এসেছেন তার আগেই? শর্মিলার একেবারে খালি হাত। একটু চুপ করে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না। বাড়িতে কেউ নেই নাকি? কিন্তু তা কেমন করে হবে? সদর এমন হাট করে

খোলা !

মুখটা তুলতেই অনেকগুলি পরিচিত দ্রব্য নজরে পড়ে। টেবিলের ওপর সেই পরিচিত টেবিল ক্লথ। কোণায় তাকে সেই ফুলহীন মাটির ফুলদানিটা। আর তার পাশেই একগাদা খাতাপত্র। আনন্দের পাণ্ডুলিপি নাকি! ধুলোয় ভরা। মাকড়শার জাল হয়েছে তার ওপর। মনে হয় দীর্ঘদিন ওর উপর কারও হাত পড়েনি। দেওয়ালে সেই ছবিখানি। বিয়ের পরে তোলা ওদের যুগল চিত্র। আনন্দের এক সহযোগী ছবিটা তুলেছিলেন হুগলীতে, গঙ্গার ধারে। ওদের দাম্পত্যজীবনে নেমে এসেছে অমাবস্যার অন্ধকার; কিন্তু ফটোতে এখনও লেগে আছে সেই প্রথম প্রতিপদের একফালি শিহরণ। আনন্দের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। শর্মিলার পরনে—কী আশ্চর্য, সেই বাসন্তী রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়িটাই। আশ্চর্য এই যে, আজও অন্যমনস্ক ভাবে সেই শাড়িখানাই পরে এসেছে সে। সকালবেলা আলনা থেকে না দেখেই যে শাড়িখানা তুলে নিয়েছিল সেখানা সেই রতনদাদুর দেওয়া ফুলশয্যার শাড়িটাই। ভুল করেছে শর্মিলা। আজ এ শাড়িটা পরা ঠিক হয়নি। অবশ্য আনন্দ কি তাকে দেখতে পাবে? এতটা চোখের দৃষ্টি হয়েছে কি তার? হয়তো জানতেই পারবে না শর্মিলা কী-সাজে সেজেছে আজ। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঐ ফটোখানার ওপর একটা কুন্দফুলের মালা দুলছে কেন? এ বাসায় ও ফটোতে কে দিয়েছে ঐ ফুলের মালাটা? আনন্দ? সে তো এখনও প্রায় অন্ধ —জানেই না, কোথায় কোন ফটো ঝুলছে। উমা? কিন্তু সে তো আন্তরিক ঘৃণা করে শর্মিলাকে। তাহলে?

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে শর্মিলা। বাইরের ঘর পার হয়েই ভেতরের বারান্দা। এক কোণে কিছু বাসনপত্র, একটা ভাঙা সাইকেল। তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে দ্বিতলে যাবার সিঁড়ি। চুন বালি খসা দেওয়াল। সরিকানি সিঁড়ি। মেজ তরফের ছেলেগুলি দুরন্ত। কাঠকয়লা দিয়ে সিঁড়ির দেওয়ালে নানান চিত্র-বিচিত্র করা। শর্মিলার অবশ্য সেসব নজর পড়ে না। সে নিঃশব্দ চরণে উঠে আসে দ্বিতলে। দ্বিতলের বারান্দার কোণায় ওর লক্ষ্মী পাতা। অন্যমনস্কের মতোই হাত দুটি কপালে ছোঁওয়ায়। হুগলীতে থাকতে ঐ পটটা পেতেছিল সে। আনন্দের নয়, উমার আগ্রহাতিশয্যে। প্রতি বৃহস্পতিবারে পাঁচালি পড়ত ঐ পটের সামনে বসে। ওর পক্ষে সেটা বেমানান। লরেটো-লালিত শর্মিলা বসু প্রাক্‌বিবাহ জীবনে এমন হাস্যকর কাণ্ড ভাবতেই পারত না; কিন্তু হুগলীর বাড়িতে সেটা কিছুই বেমানান মনে হয়নি। উমার সঙ্গে তাল দিয়ে শিবরাত্রির উপবাস করেছে, জয়মঙ্গলবার করেছে ইতু করেছে।

সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।

উমা !

যেন ভূত দেখেছে উমা। পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে যায়। শেষ ধাপটা অতিক্রম করে উঠে আসে শর্মিলা, বলে—শোধ নেবে নাকি ? তাড়িয়ে দেবে দোরগোড়া থেকেই ?

উমা বলতে পারত, ভাবল শর্মিলা—আপনি বুঝি স্বাগতা বসুর বাড়ি থেকে আসছেন ? অথবা বলতে পারত—না, দোরগোড়া থেকে তাড়িয়ে দেব কেন—আমরা তো বড়লোক নই। কিন্তু সে সব কিছুই বলল না সে। কথা বলার ক্ষমতাই বোধ করি লোপ পেয়ে গেছে তার।

—তোমার দাদা কোথায় ?—প্রশ্ন করে শর্মিলা।

এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পায় উমা। বলে—কেন এসেছ তুমি ?

শর্মিলা জবাব দেয় না। ঢোকে গিয়ে বাঁ দিকের ঘরখানায়! এটাতেই থাকত ওরা। শর্মিলা আর আনন্দ—সেই যেবার পুজোর ছুটিতে এসেছিল ! ঘরে সাবেকী বড় খাট। এক কোণায় একটা টেবিল। পুতুলের আলমারি। খান দুই চেয়ার। শর্মিলা পেছন ফিরে দেখে, উমাও এসেছে পেছন পেছন—কিন্তু কথা বলছে না সে।

—তোমার দাদা কোথায় বললে না ?

—দাদা বাড়ি নেই।

শর্মিলা হাসে। বলে—এতটা পথ এসেছি তার সঙ্গে দেখা করে যাব বলে। সত্যিই যখন সে বাড়িতে নেই তখন অপেক্ষাই করি। বলে, নির্বিকারে গিয়ে বসল একখানা চেয়ারে। আবার বলে—তুমি অবশ্য বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলোনি। দিলেও আমাকে গিয়ে বসে থাকতে হত বাইরের রাস্তায়, যতক্ষণ না সে বাড়ি ফেরে।

উমা সাহস সঞ্চয় করে বলে—কিন্তু এখন আর তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ?

শর্মিলা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে—এত বড় ব্যারিস্টারের মেয়েকে এমন বেফাঁস কথাটা বললে উমা ? রেজিস্ট্রি-ম্যারেজের সম্পর্ক কি কারও খেয়াল-খুশিতে উপে যায় ?

ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসে উমা। বলে কিন্তু আমার প্রশ্নটার তুমি জবাব দাওনি। কেন এসেছ তুমি ?

শর্মিলা বলে—সে কথাটা আমি তাকেই বলতে চাই।

উমা হঠাৎ কাতর স্বরে বলে—আমার একটা কথা শুনবে তুমি ? কাল তুমি এলে এ কথা বলতুম না। কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না। একটা দিনের মধ্যে সবকিছু বদলে গেছে! তুমি, তুমি এখুনি চলে যাও। দাদার সঙ্গে দেখা কর না। তাতে কারও কোন লাভ নেই। আর তাতে

সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে তোমার। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এক্ষুণি চলে যাও।

শর্মিলা দুরন্ত বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ উমার এ ভাবান্তরে সে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে। ভীষণ কিছু। কী সেটা? এগিয়ে এসে বলে—কেন? কী হয়েছে উমা?

—সে আমি বলতে পারব না। অত কথা বলার সময়ও নেই। তুমি আর দেরী কর না; এখুনি দাদা ফিরে আসবে।

শর্মিলা দৃঢ় স্বরে বলে—কিন্তু কেন আমাকে চলে যেতে বলছ, না জেনে তো আমি যাব না। তা ছাড়া আমিও যে জানতে চাই একটা কথা। কেন তোমার দাদা আমাকে অমন চিঠি লিখেছিল।

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে উমা বলে—সব মিছে কথা লিখেছিলাম আমি। সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

শর্মিলা এগিয়ে এসে ওর মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে—কী মিছে কথা উমা? বল, সব কথা আমাকে খুলে বল।

শর্মিলা দেখে উমার দুটি চোখে জল ভরে এসেছে। তবুও ওর চোখে চোখ রেখে বলে—দাদার দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার কথা। দাদা আর কোন দিন দেখতে পাবে না।

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে শর্মিলার। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—ও।

উমা নীরবে কাঁদছে।

শর্মিলার কিন্তু সেজন্য কোন সহানুভূতি জাগে না। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে—তাহলে সে ও কথা লিখতে বলল কেন?

উমা আবার তার মুখখানা তুলে বলে—বললাম তো, সব মিছে কথা। দাদা বলেনি লিখতে, আমি নিজেই লিখেছি ওসব কথা।

শর্মিলা আবার বলে—ও! কিন্তু কেন লিখেছিলে মিছে কথা?

এবার জবাব দিতে দেরী হল উমার।

শর্মিলা একটু কঠিনস্বরে বলে—কই, বললে না। ছোট বোন হয়ে এমন অশ্লীল জঘন্য কথাটা কেন লিখলে তুমি?

উমা বোধ করি মনস্থির করে মুখ তুলে তাকায়, বলে—হ্যাঁ, বলব। সব কথাই বলব তোমাকে, কিন্তু কথা দাও, দাদার সঙ্গে দেখা করবে না তুমি?

শর্মিলা এবারও জবাব দেয় না। উমা স্পষ্ট গলায় স্বীকার করে। বলে—মিছে কথা লিখেছিলুম তোমার ওপর শোধ নিতে। ভেবেছিলুম—

—কি ভেবেছিলে?

—আমার মাথার তখন ঠিক ছিল না। দাদা অন্ধ হয়ে গেল। না খেতে

পেয়ে আমরা মরছি আর তুমি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ শুনে আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। আমি চেয়েছিলুম তোমাকে অপদস্থ করতে।

শর্মিলা বলে—থাক। বুঝেছি। কিন্তু বারে বারে কেন বলছ, যেন আমি তোমার দাদার সঙ্গে দেখা না করি?

—ঐ তো বললাম। আজ আমার মন বদলে গেছে। আমাদের আশ্রয়-আহার দুয়েরই ব্যবস্থা হয়েছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি আজ। মাস্টার-মশাই একটি দিনে আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি আমি মেনে নিয়েছি। তুমি আবার বিয়ে কর, তুমি সুখী হও। আমার আর কোন খেদ নেই।

—মাস্টার-মশাই? তাঁর দেখা কোথায় পেলে তুমি?

—কাল রাত্রে তিনি এসেছেন। আমাদের নিয়ে যেতে।

শর্মিলার মনে পড়ল, নিচে বাইরের ঘরে একটা হোল্ডঅল আর সুটকেস দেখে এসেছে বটে।

উমা আপন মনে বলতে থাকে—মাস্টার-মশাইয়ের কথাই মেনে নিয়েছি আমি। আমাদের এ দুঃখের জীবনের সঙ্গে তোমাকে আর জড়াব না আমরা। দাদার কথাই ঠিক। তুমি বিয়ে কর। সুখী হও। কিন্তু আর দেরী কর না লক্ষ্মীটি। এখুনি দাদা ফিরে আসবে, তুমি এবার যাও দাদা না জানতে পারে তুমি এসেছিলে।

—কেন, কী হবে তাহলে?

—কেন মিছিমিছি দুঃখ দেবে তাকে, সে কি করেছে তোমার?

—বুঝলাম না।

—বুঝে কাজও নেই তোমার। তুমি ওঠ।

ম্লান হেসে শর্মিলা বলে—তাড়িয়েই দিচ্ছ তাহলে?

—হ্যাঁ দিচ্ছি। তোমার ভালোর জন্যেই দিচ্ছি।

—সেই ভালোটা কী, তাই তো জানতে চাইছি এতক্ষণ। আমি এসেছি জানতে পারলে কেন তোমার দাদা দুঃখ পাবে, তা না জেনে তো আমি যাব না।

—তুমি বোঝ না?

—না। কী?

বিচিত্র হেসে উমা বলে—দাদা নয়, তুমিই অন্ধ।

—তার মানে?

—তোমার দেওয়া সব আঘাত সত্ত্বেও দাদা আজও তোমাকে তেমনি ভালবাসে। তোমার আবার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। তোমার ভাবী স্বামী তোমাকে নেবার জন্য কাল দিল্লি থেকে এসেছেন। তুমি কাল দমদমে তাঁকে

রিসিভ করতে গিয়েছিলে। তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করছ সবই সে জানে। তবু আজও সে তোমাকে ঘৃণা করতে পারে না, ভুলতে পারে না।

—বলে যাও।

—আর কী বলব? এরপর তুমি এসেছ জানলে সে কি আর স্থির থাকতে পারবে? সে যা পাগল মানুষ, তা তো তুমি জানই, হয়তো সে—; না না, তোমার আসাটাই ভুল হয়েছে।

—কিন্তু সে যে অন্ধ তা তো আমি জেনে আসিনি। হয়তো আমি এসেছিলাম থেকে যাব বলেই।

উমা একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—যাক, এখন তো জানলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসেনি। এখন তো বুঝছ যে, এখানে তোমার থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কেন মিথ্যে জড়িয়ে পড়বে ফের!

হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে উমা। বলে—ঐ বুঝি ওঁরা ফিরে এলেন! তুমি পালাও—

উমা দরজার দিকে পা বাড়ায়। শর্মিলা ওর হাতটা চেপে ধরে বলে ও কি একেবারেই দেখতে পায় না?

—না, কিন্তু চোখ গিয়ে ওর বোধশক্তিটা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। খুব সাবধান।

—তার মানে?

কিন্তু তার মানে জানবার সময় পায় না উমা। সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দ শুনে সে চকিত হয়ে ওঠে। এগিয়ে যায় দ্বারের কাছে। শর্মিলাও উঠে দাঁড়ায়। স্তম্ভিত হয়ে সে দেখতে থাকে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আনন্দ। হাতে মোটা বেতের লাঠি, কাঁধে চাদর, চোখে কালো চশমা। আনন্দ দাড়ি রেখেছে ইতিমধ্যে। বেশ রোগা হয়ে গেছে সে এই এক বছরে। উমা নিঃশব্দে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখে। কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে শর্মিলা। নিঃশ্বাসও বুঝি পড়ে না তার।

—কথা বলছিলি কার সঙ্গে রে?—প্রশ্ন করে আনন্দ, দেওয়ালের গায়ে লাঠিখানা রাখতে রাখতে। এগিয়ে আসে সে স্বচ্ছন্দ গতিতে। কাঁধের চাদরখানা রাখে চেয়ারের পিঠে। উঠে বসে খাটের ওপর।

—কথা বলছিলাম? কই না। জোরে জোরে একটা বই পড়ছিলুম।

ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে আনন্দর। একটু থেমে বলে—ঘরে আর কেউ নেই?

—কই, না!

আনন্দ চুপ করে যায়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে পকেটে রাখে। আনন্দের দৃষ্টিহীন দৃষ্টি দেখে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে শর্মিলার।

—মাস্টার-মশাই কোথায়? প্রশ্ন করে উমা।

—নিচের ঘরে।—গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় আনন্দ। সে যেন কী ভাবছে।

সবার সঙ্গে দেখাশোনা হল ?

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ হল। তোর সব বাঁধাছাঁদা সারা ?

—হ্যাঁ সারা। ভারি তো জিনিসপত্র !

আনন্দ আরাম করে পা তুলে উঠে বসে খাটে। শর্মিলা অবাক চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। একেবারে নিঃশব্দে। একচুলও নড়ে না।

আনন্দ বলে জানিস উমা, মাস্টার-মশাই এতক্ষণ একটি মেয়ের কথা বলছিলেন আমাকে। ওঁদের আশ্রমে আছে। পোলিও হয়ে দুটি পাই অবশ হয়ে গেছে তার। পা দুটি গেছে, কিন্তু বুদ্ধিটা প্রখর হয়ে উঠেছে বয়স অনুপাতে। ভারী অভিমানী মেয়ে। ওর বাপ আবার বিয়ে করেছে। বিমাতা ওকে দেখতে পারে না। মেয়েটি বাড়ি যাবার নামও করে না। তার দাবি ওটাই তোকে নিতে হবে বিশেষ করে।

—কত বয়স হবে তার ?—প্রশ্ন করে উমা।

—ঠিক জানি না। আট-দশ বছর হবে। মিঠুয়া বুঝি নাম। দুদিন ধরে সে অনশন করে আছে। কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারছে না।

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে শর্মিলার। মিঠুয়ার কোঁকড়ানো চুলে ঘেরা অভিমানী মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে যায়।

—কেন, অনশন করে আছে কেন ?

—সে আর এক ইতিহাস। শমুকে ঐ মেয়েটা তার মরা মায়ের মতো ভালবেসেছিল। তা শমুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে চলে যাবে শুনে—

শর্মিলার দিকে তাকিয়ে উমা বুঝতে পারে ব্যাপারটা। তাড়াতাড়ি আনন্দকে থামিয়ে দিয়ে বলে—ও কথা থাক দাদা।

—কেন, থাকবে কেন ?

—ও গল্প এখন ভাল লাগছে না।

আনন্দ ম্লান হাসল। বলে—বেশ, তাহলে মিঠুয়ার কথা থাক। শর্মিলার কথাই বলি। তার সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন মাস্টার-মশাই—

—না, না। তার কথাও থাক। এ কি তোমার গল্প করার সময় ? যাও, স্নান করে এস। তোমার হলে তারপর মাস্টার-মশাইকে পাঠাব।

আনন্দ বলে স্নান করে আসব ? তা বেশ। হ্যাঁ রে, জবাকুসুম তেল আছে তোর কাছে ?

—জবাকুসুম ? না তো। হঠাৎ জবাকুসুম কেন ?

—মাথায় মাখব। বড্ড ধরেছে মাথাটা।

—তা জবাকুসুমে মাথাধরা সারে কে বলল ? মাথা ধরার ওষুধ আছে

আমার কাছে। খাবে ?

—এ ঘরে আছে ?

—না নিচে ; নিয়ে আসব ?

—যা। নিয়ে আয়।

উমা ইঙ্গিতে শর্মিলাকে ডাকে। সঙ্গে যেতে বলে। যেতে হলে আনন্দের সামনে দিয়েই যেতে হয়। আনন্দের সামনেই খোলা জানালা। শর্মিলা বিকলাঙ্গদের সান্নিধ্যে অনেকদিন কাটিয়েছে। অন্ধদের প্রখর সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে তার প্রকৃষ্ট ধারণা আছে। সে জানে, আনন্দ এবং খোলা জানালার মাঝখান দিয়ে নিঃশব্দ চরণেও সে যদি চলে যায় তবু আনন্দ বলে উঠবে—কে যায় ?

শর্মিলা জানে দৃষ্টি হারালেও এ জাতীয় অন্ধদের চোখের ওপর আলোর একটা বোধ থাকে, হঠাৎ সে আলোর ওপর ছায়াপাত হলে তারা অনুভব করতে পারে। আনন্দ জানে উমা আছে দ্বারের কাছে, এ পাশে নয়। আনন্দ যদি চোখ থেকে কালো চশমাটা না খুলত তাহলে হয়তো একটা ঝুঁকি নিলেও নেওয়া যেত। এখন কিন্তু তার সাহস হল না। অতি সন্তর্পণে মাথা আর হাত নেড়ে উমাকে জানায় যে, সে যাবে না। এখানেই অপেক্ষা করবে।

—কই যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

শর্মিলা বুঝতে পারে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ঝুঁকি না নিয়ে। উমা ঘরের ওদিকে যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে তা অনুভব করছে আনন্দ। দেখতে সে পাচ্ছে না, কিন্তু উমার পদশব্দ সে পায়নি। শর্মিলা উপলব্ধি করে কতদূর প্রখর হয়ে উঠেছে আনন্দের বোধশক্তি।

উমা নিচে যায় ওষুধটা আনতে।

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে আনন্দ! শর্মিলা ঘরের যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সে দিকে মুখ করে বলে—উমা ডাকল, বই, তুমি গেলে না যে!

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে শর্মিলার। বিস্ময়ে আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে। কিন্তু তবু এক তিলও শব্দ করে না। আনন্দ কি অন্ধ নয় তাহলে ?

ভয় করছে আমাকে ? কেন ? অন্ধই হয়েছি, পাগল তো হইনি—ভয় কি শমু ? এস, কাছে এস। আমি সত্যিই মুক্তি দিয়েছি তোমাকে। আর ভয় কর না আমাকে। তুমি আবার বিয়ে কর। বিকাশের সংসারে অন্তত অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকবে না। বিশ্বাস কর শর্মিলা, আজ খোলা মনে আমি আশীর্বাদ করছি তোমাকে।

আর সংযম বাঁধ মানে না। থরথর করে কেঁপে ওঠে শর্মিলা। দু পা এগিয়ে এসে বসে পড়ে আনন্দের সামনে হাঁটু গেড়ে। ওর হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে

বলে—তুমি—তুমি···তাহলে এতক্ষণ সব দেখতে পাচ্ছিলে ?

আনন্দ হাসে। একটা হাত রাখে শর্মিলার খোঁপায়। বলে কিছুই দেখতে পাইনি শমু। অনুভব করছিলুম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলুম। সন্দেহ ঘুচল জবাকুসুমের গন্ধে। এ তেল তুমিই শুধু মাখতে এ বাড়িতে। তোমার স্মৃতির সঙ্গে তোমার চুলের গন্ধটা মিশে আছে যে···

শর্মিলার দুটি চোখে আর্দ্রতা ঘনিয়ে আসে। আনন্দ তার অবোধ অন্ধ হাতের স্পর্শ তখনও বুলিয়ে চলেছে ওর মাথায়। কাপড়ে হাতটা লাগে। দুটি আঙুলে কাপড়ের প্রান্তটা অনুভব করে বলে—মুর্শিদাবাদে আসছ, তাই বুঝি এই মুর্শিদাবাদী ?

শর্মিলা আরও অবাক হয়ে যায়। মুখ তুলে বলে—সত্যি তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না ?

—একেবারে পাচ্ছি না বললে মিছে কথা বলা হবে। সেই ফুলশয্যা রাত্রে বাসন্তী রঙের মুর্শিদাবাদীখানা পরা তোমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য কল্পনায়।

শর্মিলার অশ্রুর বন্যা আর যে বাধ মানে না।

—এটা কী রঙের মুর্শিদাবাদী ?

শর্মিলা জবাব দিতে পারে না। ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে ওর।

আনন্দ আলগোছে শর্মিলার বাঁ হাতখানা তুলে নেয়। তার হাতের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বলে—অনেক রোগা হয়ে গেছ তুমি।

উদ্গত অশ্রুকে কোনমতে রোধ করে শর্মিলা বলে—কেমন করে বুঝলে ?

—বাঃ! এটা তো সেই চুনি বসানো আংটিটা। এটা তো মাঝের আঙুলে পরতে আগে।

শর্মিলা নিজেই ভুলে গিয়েছিল তা। অনিমেষে তাকিয়ে থাকে অনামিকার আংটিটার দিকে।

কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায় শর্মিলা; সে কেন এসেছিল ? সে এখন কী করবে ? এ কোন আনন্দের কাছে এসেছে সে ? একে তো সে চেনে না।

—ওখানে কেন শমু ? এস, কাছে এস।

শর্মিলা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আনন্দ ওর বাহুমূল ধরে ওঠাবার চেষ্টা করতেই সে ভেঙে পড়তে চায় আনন্দের বুকে। কিন্তু বাধা দেয় আনন্দই। বলে—না না, তা বলে অতটা কাছে টানতে চাইছি না। বস এখানে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রচণ্ড বেদনায় টনটন্ করে ওঠে শর্মিলার। লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! আজ এক বছর পরেও ঐ উদাসীন অন্ধ মানুষটা

একতিলও বদলায়নি। আজও সে শর্মিলাকে দুহাতে শুধু দূরেই ঠেলে দিতে চায়। আর শর্মিলা লজ্জার মাথা খেয়ে ওর বুকেই আশ্রয় নিতে গিয়েছিল।

আনন্দ বলে—আমি অন্ধ, কিন্তু পাগল নই শমু।

শর্মিলা বলে—এ কথার মানে?

—সব জেনেশুনেও কি তোমাকে আজ…, না না শমু, তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি আমি। খুশী মনেই আজ বিদায় দিতে পারব আমি। তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াটাই যে বাকি ছিল আমার।

—ক্ষমা! কী বলছ তুমি! সে তো আমি চাইব। আমার জন্যেই তোমার দুটি চোখ—

হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে শর্মিলার মুখটা চেপে ধরে আনন্দ। বলে—চুপ। এখনই উমা ফিরে আসবে।

—তার মানে? উমা আজও কিছু জানে না কি?

—কেন মিছিমিছি তোমাকে ছোট করব তার কাছে? ভুল ভুলই। সে ভুল তোমার, সে ভুল আমার। তার মাসুল আমরাই দুজন দেব। উমা কিছুই জানে না আজও।

আর নিজেকে সামলাতে পারে না শর্মিলা। কিন্তু কিছু একটা করে বসার আগেই শোনে আনন্দ বলছে—ঘরে আয় উমা; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

শর্মিলা সংযত হয়। মুখ তুলে দেখে দু চোখ মেলেও সে যা দেখতে পায়নি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে আনন্দ তাই দেখতে পেয়েছে। চিত্রার্পিতার মতো উমা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। তার হাতে জলের গ্লাস আর ওষুধের বড়ি। উমার দু চোখে আনন্দ, বেদনা, বিস্ময়, আর আতঙ্ক।

আনন্দ বলে—ভয় নেই রে উমি! আমাদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। আমরা দুজনেই দুজনকে খুশী মনে বিদায় দিয়েছি। এরপর আমিও নিশ্চিন্ত মনে আশ্রমের কাজে যেতে পারব, আর শমুও দিল্লীতে তার নূতন সংসারে—

হঠাৎ আর্তকণ্ঠে শর্মিলা বলে ওঠে: নুনা!

—না। না কি?—আনন্দের মুখে বিস্ময়।

দু হাতে মুখ ঢেকে শমু কেঁদে ফেলে। বলে—উঃ! কী নিষ্ঠুর তোমরা। তখন থেকে শুধু যাও যাও, বের হও, বের হও। কিন্তু কেন? কী করেছি আমি। না, আমি যাব না। কিছুতেই যাব না। এ আমার বাড়ি, আমার সংসার, দেখি কে আমাকে তাড়ায়।

উমা অবাক হয়ে বলে ওঠে—বউদি!

শর্মিলা সাড়া দিতে পারে না। বালিশটাকে সবলে আঁকড়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে থাকে। সে কান্নার ভাষা নেই।

—দাঁড়াও, মাস্টার মশাইকে খবর দিই। দুজন নয় আমরা তিনজনই যাব

তাঁর সঙ্গে।

একছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় উমা।

আনন্দ এবার আর কোন সঙ্কোচ করে না। শর্মিলার বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে নিজের দিকে।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে শমুর। প্রতিটি রোমকূপে জেগেছে শিহরণ। কে বলে আনন্দ অন্ধ? এতদিনে সে দেখতে পেয়েছে শর্মিলার সত্যস্বরূপ। শর্মিলার প্রেম, তার ভালবাসা, তার নারীত্ব এতদিনে সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছে। একান্ত নির্ভরতায় সে আত্মসমর্পণ করে আনন্দের বাহুবন্ধনে।

আনন্দ ওর কানে কানে বলে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মিতা! এ যে আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না!

শর্মিলা কথা বলতে পারে না তার সর্বাঙ্গ কিন্তু মুখর হয়ে জবাব দেয় এ প্রশ্নের। মিতা! এ কানে কানে ডাকা নামটা তাহলে আজও ভোলেনি আনন্দ!

সে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিমাটায় বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না। শমুর অশ্রুআর্দ্র অধরোষ্ঠে একটি ক্ষমাসুন্দর চিহ্ন এঁকে দিয়ে আনন্দ বলে মিতা! মধুমিতা!

———

নীলিমায় নীল
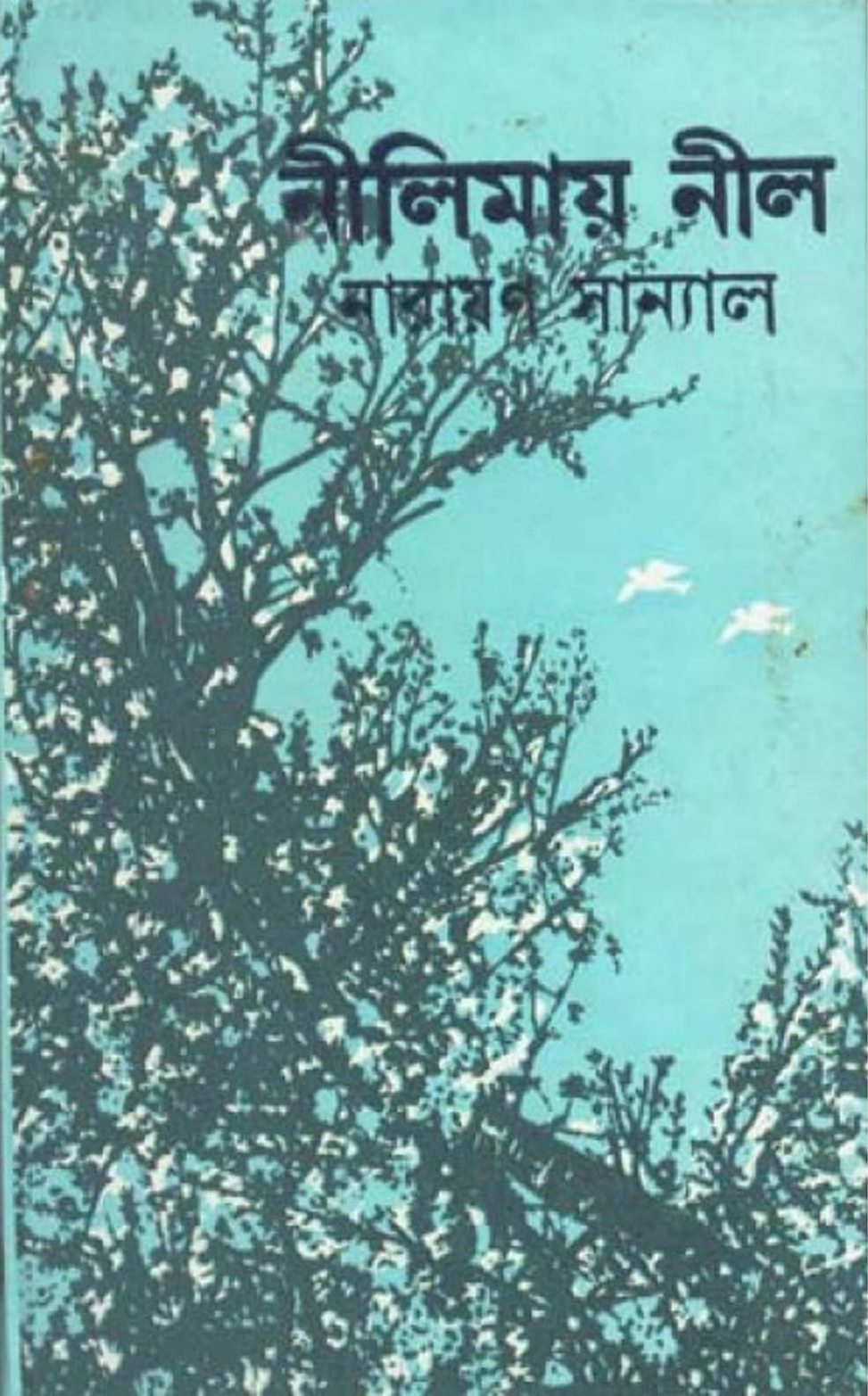
নারায়ণ সান্যাল